ভাস্কর রায়

আমাদের অন্তর্গত নির্বাসন এবং কারুবাসনা

ভাষার ভিতরেই রয়ে গেছে মানুষের অন্তর্গত নির্বাসনের বীজ। আবার সাহিত্য ভাষার শিল্প। ভাষার মুক্তি নানাবিধ চিন্তা ও অনুভূতির অবাধ প্রকাশে। সাহিত্যের অন্বিষ্টও তাই। কিন্তু এই ধরনের প্রচেষ্টা কতটা কার্যকর তা তর্ক-সাপেক্ষ। বস্তুত, সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষা বোধির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত ভাষার পরিমার্জিত রূপ মাত্র। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'কারুবাসনা' উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষা বিশেষ অর্থবহ। সাকুল্যে একশো চৌত্রিশ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসের প্রায় সবটা জুড়ে থাকে সংলাপ। সংলাপের ফাঁক ফোকরে 'সিচুয়েশন'-বর্ণনা এবং টুকরো-টুকরো কিছু চিন্তার স্বগত উচ্চারণ। সংলাপের ভাষা সরাসরি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষা থেকে তুলে নেওয়া, কেজো, খুচরো কথা আপাতদৃষ্টিতে যার কোনো গভীর অর্থ থাকে না। ভাষা অন্যত্র অন্য-প্রকার। কিন্তু সবটা মিলিয়ে ভাষার একটি সামগ্রিক রূপ-ব্যঞ্জনা তৈরি হচ্ছে, ভাষা সময়ের ভেদ মানছে না। সমুদ্রের সঙ্গে মহাকালের উপমা দিই আমরা। ভাষা এখানে তাই। এই সমুদ্র আবার মরু হয়ে যায়। ভাষা তখন অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয়। ধ্বনি গুরুত্ব পাচ্ছে। ভাষা থেকে চলে যাওয়া হচ্ছে নীরবতায়। এইভাবে নীরবতার এক ভাষা ক্রমাগত গড়ে উঠছে। আমাদের বিচার্য : উপন্যাসের চিন্তার সামগ্রিক বিন্যাসে এই ধরনের ভাষা কতটা সুপ্রযুক্ত বা ফলপ্রসূ এবং উপন্যাসের অন্যান্য উপকরণগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি সার্থক সমগ্র রূপ সৃষ্টি করছে কিনা ?

একজন 'সফলতা'-বিমুখ মানুষের 'অসফল' হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত এই উপন্যাস। তার জীবন ও শিল্পসাধনা-সংক্রান্ত কিছু সমস্যা, সমস্যাগুলি জড়িয়ে মানুষের অস্তিত্বের সংকট এবং সামগ্রিক অর্থে রূপ ও অ-রূপের দ্বন্দ্ব, এইসব উপন্যাসের বিভিন্ন স্তরে অন্বিত থাকে। বৃত্তান্তটি নানাভাবেই বলা যেত, উপন্যাসে সচরাচর যেমন বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ ঘটনার যুক্তিপরম্পরা, ঘটনা ও চরিত্রের স্থান-কাল-গত সুনির্দিষ্ট নির্দেশ, চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্বস্ততা নিয়ে ক্রমশ গড়ে ওঠা ইত্যাদি ইত্যাদি। উপন্যাসটি গড়ে উঠছে এইসব প্রথাগত সূত্রগুলি অস্বীকার করেই। 'কবিতা ঘটনাসম্ভবা নয়' এমন একটি ভাবনা ক্রমে পরিব্যাপ্ত হয়ে বৃত্তান্ত-সম্পর্কিত আমাদের চিরাচরিত সব ধারণাই পালটে দেয়। বৃত্তান্তে কাহিনী-অংশ নেহাতই কৃশ, সংলাপে ও চিন্তার বর্ণনায় কাহিনীর একটা আভাস থাকে মাত্র। কার্যত কিছুই ঘটে না এখানে। কোনো মহৎ চিন্তা বা

তত্ত্বের কথাও উচ্চারিত হয় না। আবার চেতনাপ্রবাহ, মনস্তত্ত্ব বা স্বপ্ন-বাস্তব মেলানোর খেলাটিও এখানে অনুপস্থিত। শুধুমাত্র একটি 'সিচুয়েশন', একটি 'মুড' সৃষ্টি করার অবিরত আগ্রহই থাকে। অনেকটা কবিতার মতো। কিন্তু এখানে কবি জীবনানন্দ এবং গদ্যকার জীবনানন্দের ভেদরেখাটি সুস্পষ্ট। লেখক অতি সচেতনভাবেই কবিতা হয়ে ওঠার ব্যাপারটি এড়িয়ে যান। যদিও মহৎ শিল্প মাত্রই শেষপর্যন্ত কবিতাধর্মী হয়ে ওঠে। আবার উপন্যাসের ঢঙটি একটা ডায়েরি লেখার মতো। মুখ্য চরিত্র হেম উত্তম পুরুষে এখানে বলে যায়। সে যেন কয়েকটা দিনের পরিসরে তার পরিবারের অন্যান্য চরিত্র, বাইরের জগৎ এবং তার শিল্পচর্চার সঙ্গে নিজের অবস্থানটি নানান দিকে বুঝে নিতে চেষ্টা করে। সব মিলিয়েই এই উপন্যাসের গঠনটি অভিনব। বাঙলা সাহিত্যে শুধু নয়, অন্যান্য ভাষার সাহিত্যেও এই উপন্যাস-রূপের নিকট-পুরোগামী সম্ভবত কিছু নেই। সেই অর্থে ফর্মটি পিতৃত্বহীন, প্রথম। একটা ছবির ক্যানভাস আমরা ভেবে নিতে পারি, যার ওপর এলোমেলো কিছু রঙের ছোপ, অস্পষ্ট কিছু রেখার টান কোনো সুচিন্তিত বিন্যাসের প্রতিচ্ছবি তৈরি করে না। ক্যানভাসটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে রেখে এর সঙ্গে কথনো নিরবচ্ছিন্ন ধারার শব্দস্রোত, কখনো ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাত, বৃষ্টির নানাবিধ শব্দ জুড়ে দিলে ওই রঙের ছোপ, রেখাগুলি একটা অন্তর্গত প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে একটি অনুভূতির দ্যোতনা আনে। গোটা উপন্যাস জুড়েই প্রায় থাকে বৃষ্টির উপস্থিতি। উপন্যাসের গঠন অনেকটা ওই ছবির ক্যানভাসের মতো। পুরো ক্যানভাস জুড়ে রাখা থাকে অনেকগুলি শূন্যস্থান। কাহিনী-বর্ণনার 'প্রয়োজনীয়' তথ্যগুলি ওই ফাঁকা জায়গাগুলিতে যেন আত্মসাৎ করে নেওয়া হয়েছে। উপন্যাসের বিভিন্ন অংশগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে একটি গভীর সাযুজ্য-ভাব লক্ষ করা যায়। উপন্যাসটি একটি অবিভাজ্য সত্তা নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়, সেই মুহূর্তে ঘটে যায় এর অনন্য রূপটির বিচ্ছুরণ। অবিরত একটা স্থির চিত্রকল্প তৈরি হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে কোনো একটি টেক্সট পড়ার বিষয়টি এসে পড়ে। পাঠান্তরে লেখাটি বদলাতে থাকে। ক্রমাগত একটি নতুন লেখা তৈরি হয়ে যায়।

শিল্প-সাহিত্যে বক্তব্য বা বিষয়বস্তু ব্যাপারটি বিড়ম্বনার। শিল্পী যেন তার শিল্প-কর্মটিতে একটা বক্তব্য লুকিয়ে রাখে, আমাদের কাজ হল ওই বক্তব্য বা বিষয়বস্তুকে খুঁড়ে বের করা। অনেকটা রহস্যভেদ করার মতো। বক্তব্যটি বা বিষয়বস্তুটি আবিষ্কৃত হওয়ামাত্র রহস্যেও ইতি পড়ে। আমাদের কৌতূহল মিটে যায়। 'সত্য' সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হল এই জাতীয় ভাবও কিছুটা তৈরি হয়। শিল্পী কী-ভাবে তার কথাটি বলল সেটা গৌণ হয়ে পড়ে। তার বলায় যে অনেকটাই না-বলা' থাকে সেটা আমরা নির্দ্বিধায় এড়িয়ে যাই। বস্তুত, কোনো কিছুর বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের প্রশ্নে ওই 'না-বলার' কোনো ভূমিকা থাকে না। বাস্তব এখানে সবটাই গ্রাস করে। জাপানি 'দার্শনিক' উদ্যানের পরিকল্পনাটির উল্লেখ এখানে

প্রাসঙ্গিক। পনেরোটি প্রস্তর খন্ড নিয়ে এই কল্পিত উদ্যানটি নির্মিত। আমরা যেখান থেকেই উদ্যানটি দেখি না কেন, একসঙ্গে সর্বাধিক চৌদ্দটির বেশি কখনোই দেখতে পাই না। একটি খন্ড সবসময়ই দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়। আমরা শুধু উদ্যানটির সামগ্রিক বিন্যাস দেখতে পাই। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে এর বিভিন্ন রূপ ধরা পড়ে মাত্র। শিল্পকর্মের ক্ষেত্রেও তাই। প্রশ্ন উঠতে পারে ওই পনেরোতম খন্ডটি আসলে কোনো শিল্পকর্মের একটি গূহ্য তত্ত্ব, সত্যের একটি অনড়, অচল সত্তার দিকেই নির্দেশ করছে, যা কেবল আমাদের আবিষ্কারের অপেক্ষায়। ব্যাখ্যাটি গ্রহণযোগ্য নয় যেহেতু উক্ত খন্ডটি কোনো একটি শিল্পকর্মের রহস্যময়তার কথাই ব্যক্ত করছে, তার 'না-বলা', অব্যক্ত ভাবটিই প্রকাশ করছে। আমরা শুধু নানাভাবে ওই কারুকর্মটির রস উপলব্ধি করতে পারি। এখানে বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গটি এসেই পড়ে। আসলে শিল্প-সাহিত্যে বিষয়বস্তু বলে কোনো একটি নির্দিষ্ট বস্তু চিহ্নিত করা যায় কিনা এ নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। শিল্পী তার দেখার, শোনার অনুভূতির জগৎ এবং তার স্বপ্নের জগৎ এই দুই জগৎকে যে-উপায়ে মেলায় তাতে শিল্পের অনুষঙ্গটিই আগাগোড়া পালটে যায়। এই অনুষঙ্গ বাস্তবের দু-একটি তথ্য, সূত্র সচরাচর বিষয়বস্তু হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। বাস্তব ও স্বপ্নের ওই রসায়নেই শিল্পকর্মের সার্থক উত্তরণ। সেই কারণে শিল্পে বক্তব্য বা বিষয়বস্তুর অনুসন্ধান নিরর্থক।

উপন্যাস গতি পায় একটি ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে। লেখক এই একটি মাত্র ঘটনারই আভাস রাখেন সারা উপন্যাসে। জীবিকার সন্ধানে হেম কলকাতায় ফিরে যাবে, তার জীবনে একটা সুস্থিতি আসবে এমন একটি আকাঙ্ক্ষা তার পরিবারের সবার মনে থাকে। কিন্তু কোনো এক অন্তর্গত কারণে যাত্রার ক্ষণটি ক্রমাগত বিলম্বিত হতে থাকে। লেখক এখানে একটি বাস্তব ঘটনার বিবরণে আদৌ আগ্রহী নন। ঘটনা উপলক্ষ মাত্র। একটি সংকেত। যার সাহায্যে তিনি অস্তিত্বের সমস্যা অন্বেষণ করছেন। মানুষের বেঁচে থাকার কতগুলি প্রাথমিক শর্ত এখানে উঠছে। হেমের সংশয়, উদ্বেগ আসলে একটি ব্যক্তি মানুষেরই অস্তিত্বের অন্তর্লীন সংকট। ইংরেজিতে যাকে আমরা বলি 'হিউম্যান সিচুয়েশন' তারই এক সার্থক শিল্পরূপ সৃষ্টি হয়। সংলাপে, চিন্তার বর্ণনায় হেমের কলকাতা বাসের পটভূমিটি তৈরি হয়ে যায়। সফলতা, সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ অর্জন করা এম. এ পাশ হেমের পক্ষে অসম্ভব কিছু ছিল না। কিন্তু যে-মানুষ সংসারের অ-রূপে ক্রমাগত ক্লান্ত, 'মানুষিক সৈনিক' সাজায় যার তীব্র অনীহা, যার ভিতর রয়ে গেছে প্রতি মুহূর্তে শিল্প-সৃষ্টি করার 'জন্মগত অভিশাপ' তার জীবনে নির্বাসন অনিবার্য পরিণতি নিয়ে আসে। গ্রাম ছেড়ে নির্বাসনের ওই ধূসর নিসর্গে, কর্মোদ্যোগের এক বিপুল অমানবিক স্রোতে, ফিরে যেতে গিয়ে বিবমিষা, অবসাদে আক্রান্ত হয়ে সে যেন 'সমাপ্তির গন্ধ' পায়। কিন্তু এখানেও তো মৃত্যু উপত্যকা।

বৃষ্টির প্রসঙ্গটি জরুরি। উপন্যাসে বৃষ্টি নানাবিধ 'মোটিফ' নিয়ে আসে। একটি

'মোটিফের' কথা ধরা যাক। উপন্যাসের ঘটনাবলি একটি বাড়িতে একটি পরিবারের মধ্যে সংঘটিত হয়। বৃষ্টি যেন পরিবারটিকে গোটা পৃথিবী থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন করে দেয়, পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন পৃথিবীরই একটি প্রাচীন, জীর্ণ দ্বীপের অনুষঙ্গ আনে। এই নির্বাসনের বিজন দ্বীপে কতগুলি মানুষ পাতালের বিষে জর্জরিত হয়ে অন্ধ কীটের মতো অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়ায়। চারিদিকে কেবল ক্ষয় আর মৃত্যুর চিহ্ন। উইয়ের প্রসঙ্গটি, যা উপন্যাসের গোড়াতেই আছে, এখানে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। একটি প্রাকৃতিক ক্ষয়, অনেক দিনের পুরনো একটি পৃথিবী যেন সামনের টানে আর চলতে না পেরে দীর্ঘ-প্রলম্বিত এক মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়। চারিদিকে কেবল প্রিয় জিনিসের ক্ষয়। 'নানারকম কষ্টার্জিত বই', 'মনের কর্তৃত্বে' কেনা বইগুলি উইয়ের দল ছিঁড়ে-খুঁড়ে খেয়েছে। বিশ বছর ধরে সযত্নে রক্ষিত চিঠি, এমনকি হেমের কবিতাগুলিও উইয়ের অমোঘ দংশন থেকে রক্ষা পায়নি। পরিহাসপ্রিয় সৃষ্টিকর্তা হেমের জীবন শূন্যতায় ভরে দেয়। হেম ও তার পরিবার ধীরে ধীরে গোটা সভ্যতারই প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে। 'সৃষ্টির স্রোতের ভিতরকার অক্লান্ত সৃবিধাবাদ ও অশ্রাব্য আত্মপরতা' সভ্যতারই বুকে এঁকে দেয় নির্বাসনের ক্ষতচিহ্ন। 'ঈশ্বর মৃত' এই ঘোষণাটির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নির্বাসনের বৃত্তটি সম্পূর্ণ হয়। ঈশ্বর এক মহান খুনীরূপে চিহ্নিত হন। সভ্যতার চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে কেবল খুনের চিহ্ন। স্বেচ্ছাচারী সৃষ্টিকর্তা সৃবিচারের নামে প্রত্যাখ্যাত হন। পিতার প্রিয় উপনিষদের স্তোত্র হেমের কাছে কোনো অর্থ বা স্বস্তি নিয়ে আসে না। তীব্র ক্ষোভ, বেদনা আর অস্ফুট আর্তনাদে সে ঈশ্বরকে ফিরিয়ে দেয় এবং তার সমগ্র অস্তিত্ব নিয়ে বিশ্বসৃষ্টির চরম ঔদাসিন্যের মুখোমুখি হয়। লেখক এই বিপুল পটভূমি তৈরি করেন অনায়াসে। একটি অতি সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনার বিবরণ তীব্রভাবে ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে। উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি কথা, সামান্যতম ভাবভঙ্গি প্রতিটি চিন্তার বর্ণনা গভীর প্রতীকী ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে। এখানে বাইরে থেকে কোনো চিন্তা বা প্রতীক চিহ্ন চাপিয়ে দেওয়া হয় না। উপন্যাসের স্বাভাবিক গতিতেই প্রতীকগুলি গড়ে ওঠে।

প্রাচীন, জীর্ণ দ্বীপটিতে একটি নর এবং একটি নারী, এক চিরন্তন নাটকের অক্লান্ত পুনরাবৃত্তি। চারিদিকে মানবিক সম্পর্কের চাপেই মানব ক্রমে নিঃশেষিত। স্ত্রী কল্যাণীর সঙ্গেও কি হেমের এই অ-প্রেম, অ-রূপের সম্পর্ক? দুধ খাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর কিছু খুচরো কথার বিনিময়, পুনরাবৃত্তি কি তাদের পারস্পরিক সম্পর্কেরই দূরত্ব প্রকাশ করে? কল্যাণী স্বামীর কাছে সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দই কেবল প্রত্যাশা করে? স্ত্রীকে এই স্বচ্ছলতা দিতে না পারায় হেম কি পাপবোধে ভোগে? তাই নিজে না খেয়ে স্ত্রীর দিকে দুধের গ্লাসটি এগিয়ে দেয়? নর-নারীর চিরন্তন খেলা, তাদের অন্তর্নিহিত পৃথক ব্যক্তি-সত্তার সংঘর্ষ? এই সব প্রশ্ন ওঠে; পরে কিন্তু এসবের জবাব খোঁজার আগ্রহ লেখকের নেই। বস্তুত এ যেন এক নষ্ট হয়ে যাওয়া, শুকিয়ে

যাওয়া সম্পর্কেরই নির্দয় বিবরণ! সম্পর্কটির প্রাক্-ইতিহাস এখানে উল্লিখিত নয়, তেমন জরুরিও নয়। উপন্যাসে এই সম্পর্কই এক অন্যতম প্রধান উপাদান। সামগ্রিক বিন্যাসে সম্পর্কটি গভীর অর্থ পায়। জীবনানন্দের অন্যান্য উপন্যাসের ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারটি দেখা যায়। লেখক আসলে মানুষের এই সম্পর্ক-ঘটিত মৌলিক কতগুলি প্রশ্ন তুলেছেন, নানারকম সংশয় তাঁকে আলোড়িত করছে। আবার এই সংশয় তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কিত উদ্বেগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়।

দুধ খাওয়ার প্রসঙ্গটিকে আমরা এভাবেও দেখতে পারি: দুটি নর-নারী যেন টেনিস কোর্টের দুই বিপরীত প্রান্তে, পরস্পরের দিকে ছুঁড়ে দেয় ক্ষিপ্রগতির কিছু কথা প্রতি মুহূর্তে প্রতিপক্ষের দুর্বলতাটি বুঝে নিতে। অভিনীত হয় একে অপরকে প্রবঞ্চিত করার খেলা, যা আদতে আত্মপ্রবঞ্চনা। নর-নারীর সম্পর্কে আমরা যে নিঃস্বার্থ প্রেম আর আত্মদানের দিকটি কল্পনা করে থাকি তার চিহ্নমাত্রও এখানে থাকে না। দুধ কেনা হয় কল্যাণীর জমানো এক আনিটি দিয়ে। হেমের এখন এই দুধ-কেনার সম্বলটুকুও নেই। একে অপরকে দুধ খাওয়ানোর জন্য যে অনুরোধ-উপরোধের পালা চলে তাতে একটি কৃত্রিম মোড়ক থাকে। আমাদের চিরাচরিত ধারণাগুলি বিপর্যস্ত হয়ে যায়। অতি তুচ্ছ, আপাত নিরীহ কিছু শব্দের ক্রমাগত অভিঘাতে হেম ও কল্যাণীর দূরত্ব ক্রমে বেড়ে যায়। শব্দগুলি হয়ে ওঠে অর্থহীন কিছু ধ্বনি। ভাষা হয়ে ওঠে নীরবতার ইঙ্গিত। হেম ও কল্যাণীর ভিতর অযুত আলোকবর্ষের নীরবতা নেমে আসে। তৈরি হয় একটি সুপরিচিত সামাজিক ভঙ্গির প্রতিচ্ছবি যা ভালবাসার নয়, যা বস্তুত স্বার্থের ইঙ্গিতবাহী, প্রাচীন দ্বীপটিতে নির্বাসিত নর-নারীর প্রকৃত মুখচ্ছবি। এই সবই গড়ে ওঠে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত অতি সাধারণ, 'অপরিমার্জিত' ভাষার প্রয়োগে। প্রয়োগটি অভিনব। একটি অবিশ্বাস্য প্রক্রিয়ায় ভাষার মুক্তি ঘটে যায়। খুচরো, কেজো কিছু শব্দ ক্রমাগত পুনরাবৃত্ত হয়ে চিন্তা ও অনুভূতির দ্যোতক হয়ে যায়। নির্বাসন থেকে মুক্তি, ভাষার এই নিরুপম যাত্রা।

শুধু দুধ কেন, উপন্যাসে খাওয়ার ব্যাপারটি নিয়ে নানান খেলা চলে। সংলাপের একটা বেশ বড় জায়গা জুড়ে থাকে এই খাওয়া-দাওয়ার প্রসঙ্গটি। এর আবার সিংহভাগ থাকে হেমের মেজকাকার মুখে। সংসারে গভীরভাবে আসক্ত, উদর-সর্বস্ব এই মেজকাকাটি উপন্যাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটা কাউন্টারপয়েন্টের অনুষঙ্গ এতে তৈরি হয়। হেম যে রূপের জগতের অন্বেষী কাকাটি তার বিপরীত মেরুতে। এই বৈপরীত্যের খেলায় রূপ ও অ-রূপের দ্বন্দ্বটি সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়। পুনরায় সংঘটিত হয় অতি আপাত তুচ্ছ কথার খেলা। অবসরপ্রাপ্ত মেজকাকা কদিনের জন্য এখানে বেড়াতে এসেছে। অপরের সুখ-স্বাচ্ছন্দে নির্লিপ্ত আদতে এই জীবটি নিজের উদরপূর্তি নিয়েই ক্রমাগত ব্যস্ত। নিজের কথা, নিজের সুখ, নিজের জীবনে 'সাফল্যের' কথা বলেই তার আত্মতৃপ্তি। সাধারণ ভাষা কতটা প্রতীকী হয়ে উঠতে পারে তার নিদর্শন

লেখক এখানে মুন্সিয়ানার সঙ্গে রাখেন। মেজকাকার আত্মপর ভোগসর্বস্বতা, যা বস্তুত এই সমাজেরই একটি সুপরিচিত ভঙ্গি, ভাষার প্রয়োগে তাঁর ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে। আমরা যেন ক্রমশ সভ্যতার বিপরীত দিকে টান অনুভব করি। মানুষের বিপুল কর্মোদ্যোগে সভ্যতা ক্রমশ উন্নতির পথে, মানুষ ক্রমে উচ্চতর জীবে উন্নীত হচ্ছে, ধারণাটি কার্যত খারিজ হয়ে যায়। আমরা সভ্যতার একটি প্রধান সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে যাই। লেখক অতি সচেতনভাবে প্রসঙ্গটি বারবার আনেন। এই পুনরাবৃত্তিতে আমরা সবসময়ই পরস্পর বিরোধী দুটো টান অনুভব করি—মানুষের সহজাত জীবধর্ম, প্রকৃতির মতোই যা স্বাভাবিক ও সরল, এবং মানুষের আত্মপর ভোগবাদ যা আদতে কৃত্রিম ও আত্মবিনাশী। কোনো কোনো পাঠকের কাছে হয়ত মেজকাকার প্রসঙ্গটি অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘ মনে হতে পারে। অযৌক্তিকও লাগতে পারে। পূর্বেই বলেছি, লেখকের উদ্দেশ্যটি এখানে সুস্পষ্ট। এক, একটি বাস্তব পটভূমি তৈরি হচ্ছে যা আমাদের মূল সমস্যাটির দিকে সবসময়ই সজাগ রাখে। দুই, উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রগুলির সঙ্গে মেজকাকার সম্পর্ক ওই চরিত্রগুলিকে ভিন্ন মাত্রা দিচ্ছে। তিন, হেমের সংকটের কিছু দিক মেজকাকার সঙ্গে কথোপকথনে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়।

মানুষের 'গভীর, গভীরতর অসুখ'। শিল্পী এই 'অসুখের' কেন্দ্রবিন্দুতে থেকে, সংসারের অ-রূপে যন্ত্রণাদগ্ধ হয়েও রূপের অন্বেষায়, রূপ-সৃষ্টির পথে বারবার ফিরে আসে। লেখক শিল্পী হেমকে আমাদের সামনে নিয়ে আসেন। হেম যেন আমাদের ভিউ পয়েন্ট। আবার আমরা হেমকেও দেখি। যেমন ধরা যাক বহুবার উল্লেখিত সেই দুধ-খাওয়ার প্রসঙ্গটি। হেম এখানে দু-টুকরো। শিল্পী হেম মানুষ হেম থেকে সরে আসে। কল্যাণী 'দুধের দিকে সতৃষ্ণভাবে তাকিয়ে আমার দিকে গ্লাস এগিয়ে দিচ্ছে, হাতভরা তার অনিচ্ছা ও অনগ্রসরের অসাড়তা ; মুখখানা হেমন্তের সন্ধ্যার মতো হিম, বেদনাতুর ; মৃত সন্তানের মুখের উপর নিবদ্ধ মৃতবৎসা হরিণীর মতো বিহ্বল বিষণ্ণ চোখ। উটের লোম দিয়ে যে ব্রাশ তৈরি হয়, যার সঙ্গে রঙ মিশিয়ে মানুষ ছবি আঁকে, সেই ব্রাশই-বা কোথায় ? রঙই-বা কোথায় ? ছবি আঁকবার শক্তিই বা কোথায় ?' এই ছবি আঁকার তাগিদে শিল্পী তার দৃষ্টি দৃশ্যমান বস্তু থেকে সরিয়ে নেয়। ফিরে আসে নতুনবোধে একটি সৌন্দর্য-প্রতিমা সৃষ্টি করতে। এই প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি লক্ষ করার মতো। লেখক নানাভাবে এই বিষয়টি নিয়ে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যাবর্তনের পথটি তিনি সহজভাবে রাখেন না। এখানে রক্তপাত, দ্বিধা আর যন্ত্রণার ইতিবৃত্ত থাকে। 'স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে আমাদের রক্ত-মাংস বুদ্ধি-কল্পনা আত্মা-প্রেম কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। সব জায়গাতেই কি এই রকম ?' হেম তা হলে বাঁচে কী ভাবে ? তার শিল্প-সৃষ্টির প্রেরণাই-বা কোথায় ? পুনরায় বৃষ্টির 'মোটিফ'-টি লেখক নিয়ে আসেন, অবশ্যই ভিন্ন এক মাত্রায়, নিবিড়, নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টি, বৃষ্টিসিক্ত পৃথিবীর আদিম গন্ধে হেমের মানস-প্রতিমা বনলতা হাজির হয়। প্রকৃতি, প্রেম, স্মৃতি একাকার হয়ে যায়। বিষয়টি আলোচনার

দাবি রাখে। একদিকে মানুষের সফলতা, কীর্তি, উদ্যমের ইতিবৃত্তে অনিবার্য ক্ষয়ের চিহ্ন সভ্যতাকে রিক্ত করে। অন্যদিকে প্রকৃতির স্বাভাবিক, সহজ সৌন্দর্য বহমান। হেম প্রকৃতির এই স্বাভাবিকতায় ফিরে যেতে চায়। এই আকাঙ্ক্ষাটি উপন্যাসের নানান জায়গাতে নানাভাবে ব্যক্ত হচ্ছে। হেমের প্রকৃতি-মনস্কতায় বিশ বছর আগের একটি পৃথিবীর স্মৃতির অনুষঙ্গ থাকে। বিশ বছর আগে কিশোরী বনলতা তাদের পাশের বাড়িতে থাকত। মানুষ তো অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত নিয়ে একটিই সত্তা। প্রকৃতির একটি প্রসারিত অঙ্গ। হেমের স্মৃতি বনলতাকে তুলে আনে প্রকৃতির আধারে। বাঙালি ঘরের কালো মেয়েটি আর রক্ত-মাংসের মানুষ থাকে না। শিল্পী হেমের সৃষ্ট একটি প্রতিমা হয়ে যায়। প্রকৃতি ও মানুষের কল্পনার এক অনুপম রসায়ন।

প্রকৃতির সহজ, স্বাভাবিক সৌন্দর্যে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জীবনানন্দের শিল্প-ভাবনার একটি প্রধানতম দিক। আকাঙ্ক্ষাটি নিছক প্রকৃতি-প্রেম নয়। নান্দনিক ভাবনা এখানে সামাজিক ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। হেম প্রায়ই একটি বাড়ি তৈরি করার কথা ভাবে। প্রকৃতির মধ্যে প্রকৃতিরই উপাদান দিয়ে নির্মিত একটি বাসগৃহ। আধুনিক মানুষের বহির্মুখী, আত্মপর, আগ্রাসী জীবনপ্রণালীর বিপরীতে স্বাভাবিক, আত্মগত একটি জীবনপ্রণালী। আদতে পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকারই শেষ ভরসা। প্রকৃতি-পরিবেশ অখণ্ডতার ভাবনা জীবনানন্দের প্রায় উপন্যাসেই প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। তবে 'কারুবাসনা'-তেই সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত, সামগ্রিক বিন্যাসে ভাবনাটি একটি 'মহাকাব্যের' মাত্রা আনে। কথাটি হয়ত ঠিকভাবে বলা হল না। ব্যাকরণগত অশুদ্ধি হয়ত রয়েছে। বলাবাহুল্য, উপন্যাসটিকে 'এপিক'-ধর্মী বলার কোনো অভিপ্রায় নেই। কথাটি এই অর্থে বলা যে, সভ্যতার এক বিশাল পটভূমি উপন্যাসে প্রচ্ছন্নভাবে জেগে থাকে।

বিশ বছর আগের এক পৃথিবী। যেন পৃথিবীরই শৈশব। এই বিশ বছরে হেমের জীবনে আঁকা থাকে অনেক ক্ষতচিহ্ন। যে চিঠিগুলি বিশ বছর ধরে সে জমিয়ে রেখেছিল সেগুলির অবশিষ্টও আর নেই। বন্ধু অবিনাশের চিঠি যা বিগত যৌবনের বোহিসেবি আবেগ আর উচ্ছ্বাসের. মাধুরীর চিঠি যা তাকে প্রেমের বিরহ-যন্ত্রণার অপরূপ রূপ চিনিয়েছিল সবই উইয়ের খাদ্য এখন। আর হেমের কাছে স্মৃতির খাদ্য। বাস্তবে সে যা দেখছে সবই অর্থহীন। বর্তমান তার কাছে অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয়। সে ক্রমাগত স্মৃতির 'অবাস্তবে' চলে যায়। বস্তুত একটি 'অবাস্তব' জগতে সে বাস করে। তার বেঁচে থাকার একমাত্র আশ্রয়। উপন্যাসের অনেক জায়গাতেই কেবলমাত্র ভাষার প্রয়োগে এই 'অবাস্তব' জগতের অনুষঙ্গ তৈরি হয়। ক্রমে একটি 'অবাস্তবতার' ভাষা তৈরি হচ্ছে যা সময়ের ভেদ মানছে না। যেটা শুধু ধ্বনির, একটা অব্যক্ত অনুভূতির। যেমন, এক জায়গায়: 'আমার ঘুম পাচ্ছিল। ঘাটের সিঁড়িতে অন্ধকার বৃষ্টির মধ্যে মা এত বছর ধরে তো অলৌকিক উপায়ে রক্ষা পেয়ে আসছেন। গভীর রাতে ঘরের ভিতর একবার নিঃশব্দ পায়ের সঞ্চার শুনি। শুপুরি কাটার শব্দ, গুনগুন করে খানিকটা গান; বুঝি মা

সারাদিনের কাজ সেরে ঘরে ফিরেছেন; এমনি করে চৌত্রিশ বছর দেখলাম।' কয়েক লাইন পরে : 'এমনি বাংলার অমাবস্যার রাতে কত চাষি ধানের ক্ষেতে ফিরছে, পাটের চারার ভিতর ঘুরছে, কত বধূ খাল-বিলের কাছে বসে।' এই বর্ণনাটি মেজকাকার সঙ্গে কথাবার্তার অব্যবহিত পরেই আসছে। কাকার নৈশভোজন শেষে হেমের মা ঝড়-বৃষ্টি, অন্ধকারের মধ্যে ঘাটে বাসন মাজতে চলে যায়। বর্ণনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাস্তব বলতে আমরা যে তথ্য, সূত্রগুলি বুঝি অর্থাৎ যে অনুষঙ্গে আমাদের বাস্তব-সম্পর্কিত ধারণা, তার কোনো লক্ষণই এই বর্ণনায় থাকে না। অর্থাৎ কোনো বাস্তব পরিবেশ রচিত হচ্ছে না। শব্দের ব্যবহার, তার ধ্বনিগত ব্যঞ্জনা এখানে এমন একটি অনুরণন সৃষ্টি করে যা বাস্তবকে 'ধ্বংস' করে। তৈরি হয় এমন একটি ব্যক্তিগত জগৎ যা একান্ত শিল্পেরই। এক মুহূর্তে একটি মহাকালের বোধকে ধরে রাখে, এমনি ভাষার মূর্ছিয়ানা।

বিশ বছরের জীবনধারণের ক্লান্তিতে পৃথিবীর সব রঙ-রূপ মুছে যায়। বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার, প্রিয় জিনিস হারানোর বেদনা হেমকে আক্রান্ত করে। বনলতাদের পরিত্যক্ত ভিটে তার মনে তীব্র 'নস্টালজিয়া'-র অনুভূতি আনে। ক্রমে বেদনার অনুভূতিও ফিকে হয়ে আসে। আকাঙ্ক্ষার পালকগুলি ঝরে পড়ে। অবসাদে, ক্লান্তিতে সে এখন গভীর ঘুমের আয়োজন করে। নির্বাসনের বৃত্তটি এগিয়ে আসে। একে একে অর্গল বন্ধ হতে থাকে।

উপন্যাসে তিনটি প্রজন্মের কথা থাকে। এই ব্যাপারটি জীবনানন্দের প্রায় উপন্যাসেই থাকে। তিনি যেন একটি গল্পই বারবার বলছেন। আসলে তিনি একটি গল্পই লিখছেন। হেমের পিতা গ্রামের বিদ্যালয়ের শিক্ষক। হেমের মতোই তিনি বিষয়বুদ্ধিহীন, 'সফলতা'-র সিঁড়িতে কোনোদিন পা রাখার আগ্রহ বোধ করেন নি। তিনি বেঁচে থাকার সহজ, গভীর মূল্যবোধগুলি নিয়ে ভাবেন। হেমের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন উপন্যাসকে একটা স্থিতি দেয়, যেন বা আমরা একটা অবলম্বন পেলাম এমনি একটা ভাব তৈরি হয়। তাঁর কথাবার্তায় এই প্রথম একটি মানুষের কণ্ঠস্বর শুনি। তাঁর আছে পরিষ্কার একটি বিশ্বাসভূমি। তিনি হৃদয়ের কথা বলেন, জীবনের প্রসারতা নিয়ে চিন্তা করেন। উপনিষদের স্তোত্র তাঁর কাছে গভীর অর্থ নিয়ে আসে। মানুষের বেঁচে থাকার প্রচলিত রকমগুলি তাঁর কাছে অর্থহীন। সেই কারণে দেশপ্রেম, 'সাফল্য' অর্জন কীর্তি-যশের আকাঙ্ক্ষা তাঁর বিচারে সবই বাহ্য। নিজের মুখের সামনে নিজেকে দাঁড় করিয়ে দেন। পিতাপুত্রের কথাবার্তায় 'সফলতা' / 'ব্যর্থতা' এই দ্বন্দ্বটি বিশেষ তাৎপর্য পায়। 'সফলতার' পিছনে দৌড়ে মনকে সংকীর্ণ না করে হেম যেন নিজের কাছে, নিজের শিল্প-সাধনায় অবিচলিত থেকে 'ব্যর্থতা'-ই বেছে নেয়, হেমের পিতা তাকে এমনি উপদেশ দেন। কিন্তু লেখক পুনরায় আমাদের স্বস্তি-ভাব ভেঙে দেন। হেমের পিতাও তো আসলে নির্বাসিত। উপনিষদের স্তোত্রও তো এখানে বাহ্য, একটি জোর করে আঁকড়ে ধরা অবলম্বন মাত্র। লেখক অসাধারণ নৈপুণ্যে সাধারণ কতগুলি 'অ্যাকশনের'

মারফত তাঁর একাকীত্ব ব্যক্ত করেন। তিনি এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ক্রমাগত উদ্দেশ্যহীন ঘোরাঘুরি করেন, দু-চার মিনিটের জন্য বাতি জ্বালান আবার নিভিয়ে ফেলেন, হেমের ঘরে বারবার উঁকি মারেন, অন্ধকার বিছানায় চুপচাপ বসে থাকেন, এই জাতীয় কতগুলি প্রাত্যহিক ঘটনা। একটি দীর্ঘ, নিঃসঙ্গ যাত্রার প্রস্তুতি যেন। হেম তাঁর পিতার সঙ্গে গভীর অন্তরঙ্গতা বোধ করে। কিন্তু পিতার মতো মঙ্গলময় ঈশ্বরে তার বিশ্বাস নেই। তবে শিল্প-সৃষ্টি করার ক্ষমতা রয়েছে। জীবনের অবসাদ, স্থূলতাকে আত্মসাৎ করে শিল্প-সৃষ্টির ভিতর দিয়ে সে মুক্ত হতে পারে। হেমের বাবার নিষ্ক্রমণের এই পথটি নেই। শুধু নীরবতা, একটা নিরন্ধ্র বলয়ে শুধু অবিরত হাঁটা। অতি সাধারণ উপায়ে এমন একটি চিত্র আঁকার নজির বাঙলা সাহিত্যে বিরল।

একটি দৃশ্য (উপন্যাসের শেষের দিকে) : ঝড়-বৃষ্টির রাত। পিতাপুত্র কথাবার্তার শেষে বসে-বসে ঝিমোতে থাকে। ঝড়-বৃষ্টি তাদের ঘিরে একটা বৃত্ত রচনা করেছে। হেম চোখ মেলে দেখে বাবার ঘরে আলো জ্বলছে। একটু আগেই একটা নিরাশ্রয় বিড়ালছানা কাঁদছিল। হেমের বাবা ওই ছানাটিকে ঘরে এনে দুধ খাওয়ানোর কথা বলে। হেম উঠে গিয়ে দেখে তিনি ছানাটিকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। পরক্ষণেই হেম বুঝতে পারে সে স্বপ্ন দেখছিল। 'কোথাও বিড়ালের ছানা নেই, আলো নেই, কিছু নেই, বাবার স্থূল নাক ডাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, চারদিকে অন্ধকার শ্রাবণের বাদল ও বাতাসের বীভৎস আমোদ-টিটকারী এতক্ষণে জমল তা'হলে?' হেম যা দেখছে সবই অর্থহীন, নিয়ম, রীতি কোনো কিছুই কোথাও নেই। আবিষ্কারের জায়গাও আর কোথাও নেই। তার স্বপ্ন দেখাও শেষ। একটা অসীম শূন্যতাবোধ সঞ্চারিত হয়। উপন্যাসের কাঠামোগত চিন্তায় এই জায়গাটির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একটা অন্তিম পরিণতির ইঙ্গিত থাকে। হেম সব কিছু খোঁজার শেষ প্রান্তে দাঁড়ায়। পিতার ভাব-মূর্তি, সঙ্গে সঙ্গে সনাতন মূল্যবোধের জগৎটিও ভেঙে পড়ে। পিতার সঙ্গে নাড়ির যোগ ছিন্ন হয়। যেন পরমপিতা তাকে নির্বাসিত করেছেন। সে গভীর নাস্তিবোধে ডুবে যায়। পিতার ব্যঞ্জনাটি উল্লেখযোগ্য। পিতা বলতে একটি গভীর, আদি সত্যের প্রবহমানতাকেই লেখক বোঝাতে চাইছেন। এই চিরন্তন প্রবাহকে স্তব্ধ করে অস্তিত্বের একটি শূন্য আধার তৈরি করাই লেখকের অভিপ্রায়।

জীবনানন্দ যেন নতুন করে আমাদের ভাষা শেখাচ্ছেন। স্বপ্ন ও বাস্তবে ভাষার এমন স্বচ্ছন্দ বিচরণ আমাদের বিস্মিত করে।

উপন্যাসের কাঠামোতে একটা ডায়েরির লেখার ভঙ্গি বর্তমান একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ডায়েরির উল্লেখে কতগুলি তথাকথিত বাস্তব-ঘটনা-বর্ণনার অনুষঙ্গ স্বভাবতই আমাদের মনে আসে। এখানে বর্ণিত ঘটনার বাস্তবতা ততটাই যতটা ডায়েরি লেখার কার্যটি একটি বাস্তব ঘটনা! বস্তুত সংলাপগুলি যেভাবে বিন্যস্ত রয়েছে তাতে

লেখকের একটি সুনির্দিষ্ট নক্‌শার ভাবনাই ধরা পড়ে। সংলাপগুলি আসলে তার চিন্তারই নানাবিধ প্রক্ষেপ। মনোযোগী পাঠে এই লক্ষণটি প্রকাশিত হয়। সংলাপগুলির সাহায্যে তিনি কতগুলি অর্থহীনতার শূন্য আধার তৈরি করেছেন। এই শূন্য আধার-গুলি নিয়ে তিনি একটি শূন্যতার মহা আধার সৃষ্টি করতে মনোযোগী। সংলাপগুলি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় :

স্ত্রীর সঙ্গে পাঁচ।
মেজকাকার সঙ্গে চার।
পিতার সঙ্গে চার।
মার সঙ্গে দুই।
কন্যার সঙ্গে পাঁচ।
বন্ধু বিরাজের সঙ্গে এক।
যদুনাথ বাবুর সঙ্গে এক দফায় হেমের কথোপকথন।

সংলাপগুলি অবশ্য উপরোক্ত পরম্পরায় ঘটে না। সংলাপগুলি পরপর সাজিয়ে নিলে আমরা দেখব, লেখক শূন্যতার এক একটি খণ্ড নিয়ে একটি সম্পূর্ণ চিত্রকল্প নির্মাণ করে চলেছেন। একটি চিন্তার পরিণতিই এখানে অভিপ্রেত, চরিত্রগুলির বাস্তব পরিণতি নয়। আপত্তি উঠতে পারে, শিল্প-সৃষ্টি কি এতটাই সচেতন একটি প্রক্রিয়া? কিন্তু এটাও সঠিক নয় যে শিল্পী কী তৈরি করেছে, কীভাবে করছে সেই ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কোনো শিল্পই কেবলমাত্র স্বজ্ঞা দ্বারা নির্মিত নয়। যে-প্রক্রিয়াতেই একটি শিল্পকর্ম নির্মিত হোক না কেন, তার একটি অন্তর্লীন বিন্যাস থাকবেই।

প্রথম সংলাপ কল্যাণীর সঙ্গে। সংলাপের আগে-পরে ও মাঝখানে কয়েকটি বর্ণনা। অতি ক্ষুদ্র পরিসরে উপন্যাসের মেজাজটি তৈরি হয়ে যায়। একটা গতির অনিশ্চয়তা, উদ্বেগের কেন্দ্রে আমরা পৌঁছে যাই। উইয়ের প্রসঙ্গটি এখানে রয়েছে। মেজকাকার সঙ্গে সংলাপ এর পরেই। উপস্থিত চার চরিত্র : হেম, কাকা, হেমের মা ও পিসি। একটি দীর্ঘ অধ্যায়। সংসারেরই এক দীর্ঘ-প্রলম্বিত ইতিবৃত্ত। অধ্যায়টি প্রথম সংলাপের সূত্র ধরে গড়ে উঠছে। নর-নারীর একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক গোটা সমাজ-শরীরে যেন প্রতিসরিত হচ্ছে। এখানে হৃদয়ের বিনিময় হয় না। বস্তুত মানসিক স্তরে কোনো যোগাযোগই গড়ে ওঠে না। সমস্ত কথাবার্তাই বৈষয়িক সাফল্যকে কেন্দ্র করে। ভোগের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পরশ্রীকাতরতা পরস্পরকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। ভাষা এখানে প্রবঞ্চনার। আত্মপ্রবঞ্চনার। কথাগুলি পুনরাবৃত্ত হয়ে, ব্যবহৃত হয়ে, ক্রমাগত ব্যবহৃত হয়ে অর্থহীন হয়ে যায়। আমাদের ক্লান্ত করে। লেখকের উদ্দেশ্যটি সুস্পষ্ট : প্রচলিত মানবিক সম্পর্কগুলিকে অর্থহীন, অবাস্তব স্তরে নিয়ে যাওয়া। হেম এখানে সংলগ্ন হতে পারছে না। সে যেন বহিরাগত। শ্লেষ এবং রসিকতার বর্ম দিয়ে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করার চেষ্টা করে :

যেমন, [হেম উই-দর্শিত চিঠি ও কবিতার খাতা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে]
মেজকাকা এসে বললেন, 'উইয়ে খেয়ে ফেলেছে ?'
—'হ্যাঁ।'
—'সার্টিফিকেট বুঝি ?'
মাথা নেড়ে, 'হ্যাঁ'।
—'কার সার্টিফিকেট ছিল ?'
—'বর্ধমানের মহারাজার।'
কিন্তু আত্মরক্ষার বর্মটি বড়ই ভঙ্গুর। গভীর নৈরাশ্যবোধে ডুবে যায়।

এই দীর্ঘ অধ্যায়ের অব্যবহিত পরের বর্ণনায় হেমের শিল্পীসত্তার চিত্রটি পাওয়া যায়। অনেকটা নাটকের 'পজ'-এর মতো। পরবর্তী অধ্যায়ে যেতে আমাদের যেন মানসিকভাবে প্রস্তুত করছে। আমরা শিল্পী হেমকে দেখি। সমাজের পটভূমিতে তার কারুসাধনার সমস্যা ব্যক্ত হয়।

পিতার সঙ্গে প্রথম দুটি সংলাপ। যেন সিম্ফনির 'মুভমেন্ট'-এর মতো একটি থিম প্রবেশ করল, পূর্ববর্তী অধ্যায়ের বিপরীত মেজাজ নিয়ে। মানুষ হেম ও শিল্পী হেমের সমস্যা বাস্তব পৃথিবীর পটভূমিতে ধরা থাকে। একটি মানবিক জীবনপ্রণালীর কথা এখানে বলা হয়। যার ভিত্তি কতগুলি শাশ্বত মূল্যবোধ এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস। একটা সুস্থিতির ভাব আমাদের মনে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু ভাবটি ক্ষণস্থায়ী। সংলাপের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যেতে থাকে। 'মনে মনে ভাবলাম, এই রাত আর বর্ষা যদি চিরকাল থাকত। এই বাঁশের জঙ্গলের বাতাস, ঘরের পাশের লেবু পাতার থেকে ছুপ ছুপ জলের শব্দ, মাঠে-মাঠে ব্যাঙের কোলাহল···।' হেমের এই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে একটা স্থাবরতার অনুষঙ্গ আনছে। এ-যেন আত্মবিলোপের ভাষা। অস্তিত্বের তীব্র দহনে হেম নিজেকে নিজের মধ্যে ক্রমাগত গুটিয়ে নিচ্ছে।

উপন্যাসে দুটো কণ্ঠস্বর সমান্তরালে চলে। প্রথম কণ্ঠস্বরটি হেমের। প্রতিদিনের ঘটনা যেমন যেমন ঘটে তারই বিবরণ পরপর রেখে যায়। স্বভাবতই হেম সচেতনভাবে কোনও ভাবনা করছে না। মাঝে মধ্যে কিছু চিন্তার বর্ণনা রাখছে, এই মাত্র। দ্বিতীয় কণ্ঠস্বরটি স্পষ্টতই লেখকের, অনুচ্চারিত। হেমের বিবরণের সূত্র ধরে চিন্তার একটি সামগ্রিকরূপ নির্মাণ করে চলেছে। এই নির্মাণের প্রক্রিয়া ধরে পুনরায় কল্যাণীর প্রসঙ্গ এসে পড়ে। একটা প্রচ্ছন্ন যৌনতার উল্লেখ যেন। কথাটি পরিষ্কার করা জরুরি। বলা বাহুল্য, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের অবতারণা এখানে অভিপ্রেত নয়। হেম ও কল্যাণীর সম্পর্কের এটা একটা দিক মাত্র। দম্পতিটির কথাবার্তায় মোট ছাব্বিশবার ওই জাতীয় ইঙ্গিত থাকে।

ইঙ্গিতটি সামগ্রিক বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে হেমের অতৃপ্ত যৌন ক্ষুধার প্রকাশ যেন নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্পর্কেরই স্বাভাবিক পরিণতি। উপন্যাসের এই পর্যায়ে সম্পর্কটি ভিন্ন মাত্রা পাচ্ছে। সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দের অভাবে কল্যাণী হেমের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এমন একটা ধারণা গোড়ার দিকে আমরা পেয়েছি। সমস্যাটি আরও গভীরে প্রোথিত। 'তুমি যদি রাজপুত্র হতে আর আমি যদি তোমার রাজপ্রাসাদে থাকতাম, তা হলেও এই পান্তা আর মরিচ খাওয়া ও অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে কান্না ঘুচত না আমার।' হেমের স্ত্রী নয়, হেমের অপরিচিত সম্পূর্ণ পৃথক একটি ব্যক্তিসত্তা, কল্যাণীও তো আসলে নির্বাসিত। উপন্যাসে কল্যাণীর এই সংকট বাস্তব ঘটনার বিবরণে আসে না, কার্যকারণ-বিশ্লেষণও এখানে থাকে না।

ধরা যাক, অর্থগতভাবে একটি বাক্যকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। 'থিম', অর্থাৎ, বাক্যে যে প্রচলিত অর্থটি থাকে। 'রিম' (Rheme), অর্থাৎ, বাক্যটিকে যে-ভাবে যে-জায়গায় রাখা হয়েছে তারই অনুষঙ্গে বাক্য যে নতুন অর্থ পায়। শিশুকন্যার সঙ্গে হেমের যে কথোপকথন চলে সেগুলি প্রচলিত অর্থে পিতা-কন্যার রোজকার অন্তরঙ্গ বিনিময় মাত্র। অনুষঙ্গে কথাগুলি একেবারেই পালটে যাচ্ছে। আমরা হেমের গভীর উদ্বেগ, আশঙ্কা অনুভব করতে পারছি। বৃষ্টি পুনরায় আরেকটি প্রজন্মকে হেমের সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছে, তাদের ঘিরে একটা বৃত্ত যেন আঁকা হয়ে যায়। হেম অসহায় যেহেতু পিতা কন্যাতে উত্তরাধিকারসূত্রে গভীর কিছু রেখে যেতে পারছে না। একটি গভীর, আদি সত্য যেন তার পরম্পরা হারিয়ে ফেলেছে। কন্যা থেকে সে বিচ্ছিন্ন। একটা হারানোর ভয় তাকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়। ভবিষ্যত তার কাছে অদৃষ্টের খেলা, সেই কারণে অবাস্তব, অস্তিত্ববিহীন এবং অর্থহীন। অধ্যায়টি দীর্ঘ। দীর্ঘপ্রলম্বিত, অবিরত যন্ত্রণার।

যন্ত্রণাদগ্ধ হেম জন্মদাত্রীর কাছে আসে। মার দুঃখে সংবেদনশীল, একই সঙ্গে বাবার প্রতি আনুগত্য হেমকে দীর্ণ করে। তার কথায় অভিযোগের সুর থাকে। যন্ত্রণা থাকে। হেম-কল্যাণীর সম্পর্কেরই অন্য একটি অভিব্যক্তি হেমের বাবা-মার সম্পর্ক। এ ক্ষেত্রে তফাৎ এই যে, বাবার প্রতি মার আচরণে একটি চিরাচরিত অভ্যাসের দাসত্ব থাকে। বিবাহ নামক প্রথাটি সামাজিক আচার-আচরণের অঙ্গ মাত্র, একটি যথার্থ মানবিক সম্পর্কের প্রকাশ নয়। মার কথায় স্বামীর প্রতি তার প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ আর যন্ত্রণা থেকে যায়। হেম ও কল্যাণীর সম্পর্কে এই অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি আমরা দেখি না। নর-নারীর ওই চিরাচরিত অভ্যাসের সম্পর্ককে হেম স্বীকার করে না। তার কথাবার্তায় আর্তনাদ ভেঙে পড়ে। একটি মানুষের কণ্ঠস্বর, যার সমস্ত অস্তিত্ব চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। হেম তার সমগ্র অস্তিত্বকে ধ্বংস করতে উন্মুখ। নৈরাজ্য বোধে ডুবে যাচ্ছে। মার সঙ্গে এ-ধরনের বাক্যালাপ যেমন কাহিনীর কাঠামোগত দিক, তেমনি মনস্তত্ত্বের দিক

থেকেও যথোপযোগী। কাঠামোগত দিক থেকে, কারণ হেম চূড়ান্ত সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে, যেহেতু মা জন্মদাত্রী, আদি সত্য, যার কাছে ক্ষোভ, যন্ত্রণা, জিজ্ঞাসা নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেকে উন্মুক্ত করা যায়। এই অর্থে বাবার সঙ্গে কথাবার্তা মূলত মস্তিষ্কজাত, মানুষের সমস্যা নিয়ে বৌদ্ধিক আলাপচারিতা। মার সঙ্গে কথাবার্তার অব্যবহিত পরেই পিতার সঙ্গে সংলাপটি আসে। আমরা পূর্বেই এ-নিয়ে আলোচনা করেছি। পূর্ববর্তী পরবর্তী দুই প্রজন্মের সঙ্গে হেমের নাড়ির যোগ ছিন্ন হয়ে যায়।

একটি মানবিক প্রয়াস। শেষ একটি প্রচেষ্টা যা হেমকে একটা অবলম্বন দিতে পারে। অস্তিত্বের অর্থ খুঁজে পেতে পারে হেম। একটি সম্ভাবনা। কল্যাণী হঠাৎ যেন সজীব হয়ে ওঠে। তার বিগত জীবনের প্রেমাস্পদ, স্বাধীনতা-যোদ্ধা নির্মল, এক অজ পাড়াগাঁয়ে মৃত্যুশয্যায় পড়ে আছে। গয়না বিক্রি করে কল্যাণী তার পাশে দাঁড়াতে চায়। মৃত্যুপথযাত্রী নির্মলকে সাহচর্য দিতে সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কল্যাণীর জীবনের এই অধ্যায়টি হেমের কাছে অপরিচিত ছিল। কল্যাণীর ভিন্ন এক রূপ দেখে সে বিস্মিত হয়। বনলতার কথা ভাবে, কল্যাণীর এই ভূমিকায় বনলতাকে দেখতে চেয়ে ভাবনাটির অসাড়তা উপলব্ধি করে। তার বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রবল হয়। কিন্তু কল্যাণীর প্রচেষ্টার সাফল্যে সে উদযোগী হয়। এখানে এক ধরনের মর্মকামী প্রবণতা প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। তার অতৃপ্ত যৌন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এই প্রবণতার যেন একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্র রয়েছে। যোগসূত্রটি তাৎপর্যপূর্ণ যেহেতু হেম ক্রমাগত নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজছে, যদিও এই পথটি শেষ পর্যন্ত নির্বাসনের বলয়েই ফিরে আসে। আমরা অন্যভাবেও বিষয়টি দেখতে পারি। একটি সদর্থক দিক; কল্যাণীকে একটি স্বাধীন মানুষ হিসাবে দেখার আকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষাটি বাস্তবায়িত হয় না। কল্যাণী পরাজিত, সংসারের চিরাচরিত অভ্যাসের কাছে আত্মসমর্পণ করে। একটি মানবিক প্রয়াসের সম্ভাবনা ব্যর্থ হয়ে গেল। হেমের স্মৃতির জগতটি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ('হয়ত বনলতাও আজ এই রকম।') অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতবিহীন একটি পরম শূন্য অস্তিত্ব। শেষ অর্গলটি বন্ধ হয়ে যায়।

একটি দীর্ঘ-প্রলম্বিত প্রলাপ। মার সঙ্গে শেষ সংলাপটি অনিবার্যভাবেই আসে। হেমের কথাবার্তায় অভিযোগ ও তিক্ততার স্তর আর থাকে না। হেম যেন রোগশয্যায় শায়িত শিশু। অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে কথাবার্তায় হেমের কলকাতা বাসের বৃত্তান্ত থাকে। কিন্তু এখানে তার প্রকৃত চিত্রটি আমরা পাচ্ছি। বাক্যের দ্বৈত চরিত্র এখানে নানান স্তরে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে।

—'যদি যক্ষ্মা নিয়ে আসি, তা হলে তোমরা কী করবে।' হেমের আশঙ্কা, আসলে তার অন্তর্গত উদ্বেগের বহিঃপ্রকাশ।

—'মেজকাকার জন্য আজ লুচি ভাজবে না?'

—'কেন?'

– 'আমাকে একখানা দেবে ?'

শিশুসুলভ আবদার, হেম যেন শৈশবের নিশ্চয়তায় ফিরতে চায়।

ইত্যাদি ইত্যাদি।

কলকাতা বাসের প্রকৃত চিত্র। বর্ণনাটি একটি দীর্ঘ মনোলগ। যেন রোগশয্যায় শায়িত হেমের প্রলাপ। শব্দের অভিঘাতে দুঃসহ একাকীত্ব আর শূন্যতাবোধ উঠে আসে। এখানে একটি ক্রমাগত হাঁটার উল্লেখ থাকে। হেম যেন অনন্তকাল ধরে অসীম শূন্যতায় হাঁটছে। তার আত্মহননের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। মার কাছে হেমের এই স্বীকারোক্তি তাৎপর্যপূর্ণ, যেহেতু একমাত্র জন্মদাত্রীর কাছেই এরকম আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা যায়। এতে একটি পরম সমাপ্তির দ্যোতনা থাকে। কিন্তু আত্মহনন 'দড়ি ঝুলিয়ে' বা 'বিষ খেয়ে' নয়। 'সন্ধ্যার সোনালি মেঘের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেতে ইচ্ছে করে' এই রকম বাসনাটিতে থাকে হেমের অন্তিম প্রয়াস, অ-রূপের জগৎকে প্রত্যাখ্যান করার একটি দুঃসাহসিক অন্তিম বাসনা।

প্রাচীন দ্বীপটিতে একজন আগন্তুক। যদুনাথবাবু চিত্তবান পুরুষ, উদ্যম আর সাংসারিক সাফল্যে যার সহজাত বিচরণ। তিনি যেন মুক্তিদাতা। হেমকে তিনি নিষ্ক্রমণের নানা পথ বাতলাচ্ছেন। বিপুল কর্মকাণ্ডের কথা তিনি অনায়াসে বলে ফেলেন। আবার দর্শনের কথাও বলেন, যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞ। 'ভগবান নির্বাণ দেন নি, দিয়েছেন স্মৃতি, ভালবাসা দিয়েছেন। সমুদ্রের মত আকাঙ্ক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু দেহটাকে তৈরি করেছেন দুই রক্তি ঘুণ দিয়ে', এই জাতীয় কথা। আমরা শব্দবাণে বিদ্ধ হই। রাশি রাশি বস্তুপুঞ্জ দ্বারা আক্রান্ত হই। আমরা অনুভব করি, হেমের প্রত্যাবর্তনের পথ, আমাদের রূপের জগতে ফিরে যাওয়ার পথ ক্রমশ রুদ্ধ হয়ে আসছে, 'নির্বাসনের এক নিরন্ধ্র বলয়' আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব গ্রাস করে নিচ্ছে।

ইতিকথার পরের কথা। জীবনের অবসাদ আর স্থূলতা আত্মসাৎ করে হেম, জীবনানন্দ 'কারুবাসনা' লিখে ফেলেছেন। তিনি নির্মুক্ত হয়েছেন। গ্রিক পুরাণ-উক্ত ভাস্কর পেরিলেসের উপাখ্যানটি এখানে প্রাসঙ্গিক। এক স্বৈরাচারী শাসক পেরিলেসকে একটা ব্রোঞ্জের ষাঁড় নির্মাণ করতে আদেশ করে। পেরিলেস ষাঁড়টি নির্মাণ করেন। নির্মিত ষাঁড়ের ঠোঁটদুটোর মধ্যে একটা বিশেষত্ব রেখে দেন। বিশেষত্বটি এই রকম : ব্রোঞ্জের ষাঁড়ের ফাঁপা পেটে একটি মানুষকে ঢুকিয়ে যখন তলায় আগুন দেওয়া হয় তখন ওই মরণোন্মুখ মানুষটির তীব্র আর্তনাদ ওই ঠোঁটদুটোর মধ্য দিয়ে সঙ্গীত হয়ে বেরিয়ে আসে যেন। বলাবাহুল্য, স্বৈরাচারী শাসক পেরিলেসকে দিয়েই প্রথম পরীক্ষাটি করে। পৃথিবীর অসুখের গভীরে থেকে শিল্পী যন্ত্রণায় চিৎকার করছে আর তার চিৎকার ক্রমাগত শিল্পের অপরূপ রূপ হয়ে যাচ্ছে। জীবন ও শিল্পের এই চিরন্তন সংঘাত।

'কারুবাসনা' উপন্যাসটি ১৯৩৩-এর আগস্ট মাসে রচিত। জীবনানন্দের অন্যান্য গল্প-উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসটিও দীর্ঘদিন অপ্রকাশিত ছিল। বস্তুত কিছুকাল আগেও গল্পকার জীবনানন্দের পরিচিতি পাঠকের কাছে ছিল না। সম্প্রতি দেবেশ রায়ের সম্পাদনায় প্রতিক্ষণ প্রকাশনী জীবনানন্দের গল্পের কয়েকটি খণ্ড বের করেছে। 'কারুবাসনা' উপন্যাসটি উক্ত সঙ্কলনের তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু বেশির ভাগ পাঠকই উপন্যাসটি পড়েননি (তন্মধ্যে এই নিবন্ধটি মূল উপন্যাস পাঠে পাঠককে উৎসাহিত করুক সেটাই একান্ত কামনা বলেও)। নিচে উক্ত উপন্যাস থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করা হল। আমাদের আশা, ওই অংশটি থেকে পাঠকেরা জীবনানন্দের গদ্যরীতি এবং উপন্যাসটির ধরন কিছুটা ধরতে পারবেন। সঙ্গে অংশটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের প্রয়াসও রইল। অংশটি 'প্রতিক্ষণ'-এর সৌজন্যে মুদ্রিত।

জীবনানন্দ দাশ প্রণীত কারুবাসনা উপন্যাস থেকে

...

খুব মৃদু চটি জুতোর শব্দ।

ঘরের ভিতর বাবা এসে ঢুকেছেন।

—'খোকা'।

—'আমাকে ডাকছ বাবা?'

—'শুয়ে আছিস যে?'

—'এমনিই, তুমি কখন ইস্কুল থেকে এলে?'

—'অনেকক্ষণ।'

—'সাড়াশব্দ পাই নি তো।'

—'বারান্দায় বসে ছেলেদের এক্সসাইজ খাতা দেখছিলাম। তোর মা কোথায়?'

—'রান্নাঘরেই তো—'

—'তা হবে; দেখলাম এক থালা লুচি ভেজে সুরেশকে দিল; বিকেলে তুই খাস নি?'

—'না। তুমি?'

হেমের বাবা আসছেন। সহজ ও প্রাত্যহিক ঘটনা। উপস্থাপনার বিশেষত্বে তা মুহূর্তে হয়ে উঠছে বিশেষের প্রবেশ। পিতার প্রবেশ ('খুব মৃদু চটি জুতোর শব্দ')। এক, তাঁর অন্তর্মুখী, নিভৃত স্বভাবটি ব্যক্ত হচ্ছে। দুই, পরিবারে তাঁর ভূমিকা চিহ্নিত হচ্ছে। অন্ন যে জোগায় সেই সর্বময় কর্তা, তারই ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর সংসার চলে, সংসারে এই জাতীয় ব্যবস্থা স্বাভাবিক মনে করা হয়। পিতার চরিত্রে এই ধরনের ভাবনার কোনও প্রতিফলন নেই। তাঁর চলাফেরায় কর্তৃত্ব-ফলানোর

—'আমি ঐ ছোলা ভিজিয়ে রেখেছিলাম, একটু গুড় দিয়ে দিয়ে খেলাম। খাবি না কি ?'
—'আছে আরো ?'
—'ঢের আছে—'
বাবা ছোলা-গুড় আনবার জন্য উঠে যাচ্ছিলেন।
বাধা দিয়ে—'আচ্ছা আমিই নিয়ে আসব এখন, তুমি বসো।'
—'আচ্ছা বেশ'
একটু হাই তুলে 'বৃষ্টি পড়ছে যে রে, টের পাসনি ?'
—'হ্যাঁ পেয়েছি।'
—'তা হলে ঝাঁপি খুলে রেখেছিস কেন ?'
—'কী আর হবে ?'
—'জানলার জলের ছাট এসে টেবিলের বইগুলো ভিজে যাচ্ছে যে।'
—'থাক। এমন কী আর বই ?'
—'কেন, কোনো ভাল বই নেই ?'
মাথা নেড়ে—'না।'
বাবা বললেন—'খানিকটা খুচরো চা এনেছি'।
—'মেজকাকার জন্য ?'
—'না, সুরেশ কি আর এই ছ-আনা পাউন্ডের চা খাবে ?'
—'ছ-আনা বুঝি ?'
—'হ্যাঁ। চা খাবি ? তা খাওয়াই ভাল, এই বৃষ্টি-বাদলের দিনে ঠাণ্ডা লাগে, একটু গরম চা বেশ কাজ করে ; সর্দি-কাশি নষ্ট হয়, মনের ভিতর একটু আশা-ভরসাও পাওয়া যায়। তোমার মাকে দিও, করে দেবে।'
—'তুমি খাবে না ?'
—'চা খাওয়ার অভ্যেস নেই আমার।'

সামান্যতম প্রবণতা দেখা যায় না। তিনি একমাত্র স্নেহ-ভালবাসার সম্পর্কে আস্থাশীল। প্রথম বাক্যটি থেকে ষষ্ঠ সংলাপ ('সাড়াশব্দ পাইনি তো') তাঁর আত্মগত, নীরব অস্তিত্ব প্রকাশ করছে।

তিন, একটি সাঙ্গীতিক অনুষঙ্গ এখানে অনুভব করা যায়। যেন অতি মৃদুলয়ে একটি 'থিম' প্রবেশ করল, অনেকটা সিম্ফনির মুভমেন্টের মতো। প্রসঙ্গত, উপন্যাসের মূল ভাবের বিস্তার এই অংশে ঘটেছে। 'বাবা ছোলা-গুড় আনবার জন্য উঠে যাচ্ছিলেন'

—'নেই আবশ্যি, কিন্তু—'
—'খেলে ঘুম হবে না যে রে।'
চায়ের মোড়কটা জীর্ণ-বিবর্ণ শাদা খদ্দরের কোটের পকেটের থেকে বের করে বাবা টেবিলের ওপর রাখলেন।
বললেন—'কলকাতায় যাবার টাকাটা জোগাড় করেছি। কবে যাবে?'
—'একদিন গেলেই হয়।'
—'যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় ততই ভাল।'
—'এই সাত বছর ধরে কত বারই তো এলাম-গেলাম, বাবা।'
—'কিন্তু এবার তো গত সাত বছরের মত হবে না।'
—'হবে না?' একটু হেসে, 'কী করে তুমি জানলে বাবা?'
—'আমার বিশ্বাস, তোমার মারও বিশ্বাস···'
একটু বিদ্রূপ করে হেসে বললাম, 'কী যেন বলছিলাম···'
বাবাকে আহত হতে দেখে জানলার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে চুপ করে রইলাম।
—'তোমার মেজকাকার সঙ্গে কথা হয়েছিল?'
—'হ্যাঁ।'
—'চাকরি-বাকরির কথা?'
—'হ্যাঁ, হয়েছিল।'
—'কী বললেন?'
—'বললেন, তুমি আর তোমার বাবা ইহকালটা নমো-নমো করে কাটিয়ে দাও, পরকালে হয় ত কপাল খুলে যাবে।' দু-এক মুহূর্ত বাবা শ্রীহীন, জীর্ণ, ক্ষীণ মুখে বসে রইলেন।
তারপরেই হো-হো করে হেসে—'ও, তা এই বুঝি বললে সুরেশ?'
—'হ্যাঁ।'

পিতা-পুত্রের সুন্দর একটি সম্পর্ক আমরা পাচ্ছি। পিতা-পুত্রের সম্পর্ক অধীনতার নয়, বরং বন্ধুত্বের। আবার পিতার উদার চরিত্রের একটি নিদর্শনও এখানে থাকে। 'বৃষ্টি পড়ছে যে রে, টের পাস নি' থেকে (মাথা নেড়ে—'না') হেমের বর্তমান মানসিক অবস্থা নির্দেশিত করছে। সবকিছুর প্রতি অনীহা তাকে স্থবিরতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। 'চা খাবি? ····· মনের ভিতর একটু আশা-ভরসাও পাওয়া যায়'—পিতার এই কথাটি উল্লেখযোগ্য। এতে পিতার একটি বুদ্ধিশীল, সংস্কৃত

—'মন্দ বলে নি। কিন্তু পরলোকে আমি তো বিশ্বাস করি।'
—'আমি তো কিছুতেই করে উঠতে পারলাম না।'
—'পারলে না?'
—'মৃত্যুর পর কী আর থাকে?'
—'থাকে বই কি; সমস্তই থাকে; আরো গভীর অধ্যাত্মভাবে থাকে, উপনিষদের—'
—'উপনিষদ যাঁরা তৈরি করেছেন তাঁরা পরলোক থেকে ফিরে এসে রচনা করেন নি তো; রক্ত মাংসের শরীরে ইহলোকে বসে যে—ধারণা তাদের ভাল লেগেছে তাই ব্যক্ত করে গেছেন; তাঁদের বিশ্বাসে আশ্বস্ত হবার কোনো কারণ দেখি না।'
—'এক দিন হয় ত দেখবে।'
—'আশীর্বাদ করো, দেখতে পারি যেন।'
—'নিজের মনের আন্তরিক অনুসন্ধানে যা সত্য বোধ হয় সেই টেঁকে; বিশ্বাস করো এই আশীর্বাদ করি।'
—'তা হলে হয় ত চিরজীবন অবিশ্বাসী হয়েই থাকব।'
—'থেকো।'
—'ভাবতে গেলে তোমার দুঃখ করে না বাবা?'
—'কী দুঃখ? একে-একে যে দুই হয় এ-কথা যদি আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না, আমার বুদ্ধি-বিচার কল্পনা সমস্তই যদি সাধ্যস্ত করে যে তিন হয়— তা হলে এই অন্ধতার অভিশাপ বুকে নিয়েই জীবনের পথে চলতে হবে; এ অভিশাপ মোচন করবার শক্তি আমার নেই। কোনো মানুষের নেই— বিধাতা যদি দয়া করে আলো দেন তবেই তা ঘুচতে পারে।' শাদা গোঁফ জোড়ায় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বাবা বললেন—'কিন্তু এটা মনে করো না হেম, যে একে-একে তিন হয়, দুই হয় না। এই ভুল ধারণা নিয়ে তুমি জীবন চালাচ্ছ। হয় তো আমার এ ভগবানে বিশ্বাস, পরলোকে ঐকান্তিক আস্থা, সেই সব ভুল; জীবন-মৃত্যুতে আমিই ধোঁয়ার ধাঁধা নিয়ে কাটালাম।' বলে শাদা গোঁফে হাত

মন প্রকাশিত হচ্ছে। শুধু উদর-পূর্তি নয়, মানুষের খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন মূলত তার মনকে সজীব রাখতে। এই প্রসঙ্গে আমরা মেজকাকার কথা স্মরণ করতে পারি। তার ভোজনবিলাস আদতে এই সমাজের লোভী, ভোগবাদসর্বস্ব মনের পরিচয় দেয়। এই দুই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখক সূক্ষ্মভাবে রূপ ও অরূপের দ্বন্দ্বটি নির্মাণ করছেন। বলা বাহুল্য, এই নির্মাণে অন্যান্য উপাদানও ব্যবহৃত হয়েছে। 'খানিকটা খুচরো চা এনেছি' থেকে 'খেলে ঘুম হবে না যে রে' পুত্রের প্রতি

বুলিয়ে হাসতে লাগলেন আবার।
বললেন 'যাক্ দু-তিন বছরের মধ্যেই বুঝতে পারব সব।'
চোখ তুলে তাকালাম বাবার দিকে।
—'ভগবান ও শান্তির দিকেই যাচ্ছি, এই ভেবে মরব।'
—'কিন্তু এও তো হতে পারে মরে জেগে উঠব না আর।'
খানিকক্ষণ চুপচাপ।
বাবা বললেন — 'কলকাতায় গিয়ে পঁচিশ টাকার ইস্কুল মাস্টারি নিও না।'
—'কেন?'
—'হেড মাস্টার হয় ত সামান্য বি. এ. পাশ, ফার্স্ট ক্লাশ, সেকেণ্ড ক্লাশে ইংরেজি পড়াচ্ছেন, আর তোমাকে দেওয়া হবে ভূগোল আর অঙ্ক পড়াতে। এ সব অবিচার চোখ বুজে ক্ষমা করে দেবার মত কোনো প্রয়োজন দেখি না আমি।'
চুপ করে ছিলাম।
—'হ্যারিসন রোডের মেসে যদি থাকো তা হলে উল্টাডিঙ্গি, ঢাকুরিয়া বা চেতলা-ফেতলায় কোনো টিউশন নিতে যেও না।'
—'নেব না?'
—'না'
—'কেন?'
—'এ সম্বন্ধে আমার মতামত খুব ভাল করেই জানো। হয় তো কুড়ি টাকা-পঁচিশ টাকা দেবে তোমাকে, কিম্বা আরো কমই দেবে হয় ত, জীবনে টাকার মুখ তুমিও কম দেখেছ, সে ট্রেন ভাড়া দিতে গিয়ে তোমার অন্তঃকরণ খেঁকিয়ে উঠবে একেবারে। এ বড় দীনতার কথা, মানুষ এতে বড় খাটো হয়, বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে পায়ে হেঁটে যাবে সেই উল্টাডিঙ্গি, পায়ে হেঁটে ফিরবে আবার; শরীরের দিক দিয়ে এর ভেতর যত না কষ্ট, আত্মার দিক দিয়ে তার চেয়ে ঢের বেশি অপচয়; কেন এ অপচয় করবে তুমি?'

পিতার গভীর স্নেহ প্রকাশ পাচ্ছে, কিন্তু এই অনুভূতির বহিঃপ্রকাশে তিনি যেন কুণ্ঠিত। আবার সংসার দ্বারা বঞ্চিত পুত্রের প্রতি সহানুভূতিও থাকে। পুত্রের জন্যই তিনি যে চা এনেছেন এটা স্পষ্ট, যেহেতু তিনি নিজে চা পান করেন না। অংশটির এই পর্যায় অবধি খুচরো কিছু কথার বিনিময়ে পিতা-পুত্রের গভীর সম্পর্ক বর্ণিত হয়ে যায়। 'কলকাতায় যাবার টাকাটা জোগাড় করেছি' থেকে '—পরকালে হয়তো কপাল খুলবে' একটি বাস্তব সমস্যার উত্থাপন। হেমের জীবিকার সমস্যা। এই

একটু চুপ থেকে হেসে—'তা না-হলে কী করব ?'

—'তা তুমি জান, আমার সন্তান হয়ে যখন জন্মেছ তখন অনেক বেদনা বইতে হবে তোমাকে। কিন্তু প্রাণ যাতে চিমসে হয়ে যায়, ক্ষুদ্র হয়ে পড়ে, এমন কোনো জিনিশ করো না তুমি ; বেদনা ও সংকীর্ণতা এক জিনিশ নয়। যে-কোনো কাজে বা চিন্তায় জীবনের প্রসার নষ্ট হয়, তার থেকে নিজেকে ঘুচিয়ে নিও। বরং বাড়িতেই চলে আসবে আবার ; কী আর করবে ? পনের টাকার টিউশনের জন্য, টিউশনের টাকার প্রতিটি কানাকড়িও বাঁচাবার জন্য হ্যারিসন রোড থেকে চেতলায় হেঁটে যাওয়া-আসা জীবনের এত বড় শকুন কোনোদিন সাজতে যেও না তুমি।'

হাসছিলাম।

বাবা বললেন—শকুন ; কিন্তু বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে দশ টাকা-পনের টাকার টিউশন এর জন্য যারা চেতলা-উল্টোডাঙা পাড়ি দেয় তাদের দলে ভর্তি না হলে কলকাতায় যুদ্ধে যে আজকাল চলে না বাবা কি তা জানেন ? দশ টাকা না হোক, বিশ টাকা পেলে ?

বাবা বললেন—'কলকাতায় গিয়ে চা খাও না ?'

—'খাই'

—'দোকান থেকে ?'

—'হ্যাঁ'

—'বৌমার ঘরে একটা স্পিরিটের স্টোভ পড়ে আছে, খুকি হবার সময় কেনা হয়েছিল, সেইটে নিয়ে নেও।'

—'আচ্ছা'

—'এক বোতল স্পিরিট কিনে নেবে—খানিকটা খুচরো চা, নিজে তৈরি করে খাবে।'

—'তা খাওয়া যায়।'

—'আর খানিকটা বাতাসা, চা-র সঙ্গে। সন্ধ্যার দিকে কী করো ?'

—'যদি টিউশন থাকে তো ছেলে পড়াতে যাই।'

বিষয়ে হেমের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট। 'কী করে জানলে বাবা' হেমের এই কথায় তার কলকাতায় জীবিকার্জনের ব্যর্থ অভিজ্ঞতা, ফলত তার চূড়ান্ত নৈরাশ্যবাদের, নির্দেশ থাকে। আবার কথাটি পিতার বিশ্বাসী জগৎকেই প্রশ্ন করছে। 'মিরাকল' কিছু ঘটে না, সংসার এমনই স্থূল, বাস্তব। 'পরলোকে আমি তো বিশ্বাস করি' থেকে 'কিন্তু এও তো হতে পারে মরে জেগে উঠব না আর' পিতা-পুত্রের দুটি ভিন্ন জগতের চিত্র। 'উপনিষদ যাঁরা তৈরি করেছেন···তাঁদের বিশ্বাসে আশ্বস্ত হবার কোনও কারণ দেখি

—'আর যদি না-থাকে ?'

—'তা হলে ফুটপাথে বেড়িয়ে-বেড়িয়ে, ওল্ড বুক শপের দু-চারখানা বই নেড়ে দেখি, এক-একটার কাছে গিয়ে দাঁড়াই, আবার হাঁটি, চায়ের দোকানের খবরের কাগজ নিয়ে চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে থাকি।'

—'বাঃ, এ সব কি মানুষের ভাল লাগে ?'

—'না, আগে ভাল লাগত না একদম, কিন্তু কয়েক বছর ধরে তালিম হয়ে গেছে।'

—'কিন্তু তবুও এ ত সত্যিকারের জীবন নয়।'

—'তা হয় ত নয় আমার কি ইচ্ছে করে জানো ?'

বাবা তাকালেন আমার দিকে।

বললাম— 'মস্ত বড় একটা মাঠের মধ্যে কুঁড়ে ঘর বানিয়ে থাকি ; পাশে মেঘনা কিংবা কর্ণফুলী, অথবা ইছামতী। পেটের জন্য কোনো চিন্তা থাকে না, দিন রাত লিখি আর পড়ি। দিগন্তবিস্তৃত সোনালি খড়ের মাঠের কিনারে বেড়াই, লাল আকাশ ভেঙে সন্ধ্যার দাঁড়কাকগুলোকে ঘরে ফিরে চলে যেতে দেখি।'

বাবা চুপ করেছিলেন।

বললাম— 'কিন্তু এ হয় ত শখ হল, পলায়ন হল, জীবন হল না। জীবন হয়ত ভিড়ের মধ্যে মিশে যা করতে ইচ্ছা করে না, ভাবতে ভাল লাগে না, সেই অপ্রেমের কাজ ও চিন্তার জন্য সহানুভূতি ও সাহায্যের চেষ্টা।'

খানিকটা সময় কেটে গেল।

বাবা এ-সব কথার কোনো উত্তর দিলেন না।

বললেন— 'কলকাতায় তোমার কোনো বন্ধু-বান্ধব নেই ?'

—'বছরের পর বছর ক্রমেই কমে যাচ্ছে।'

—'কেন ?'

—'মতিগতির পার্থক্য বেড়ে যাচ্ছে হয় ত—'

না'—মানুষের একটি মূল সমস্যা এখানে ব্যক্ত হচ্ছে। এই জাতীয় বিশ্বাস মানুষকে গভীর জীবনের পথ দেখাতে পারে কি না হেমের যথেষ্ট সংশয় থেকে যায়। ফলত হেম তার ব্যক্তি-সত্তা নিয়েই জগতের মুখোমুখি হয়। 'জীবন-মৃত্যুতে আমিই ধোঁয়ার ধাঁধা নিয়ে কাটালাম'—পিতার মনেও সংশয়ের বীজ থাকে। '...মরে জেগে উঠব না আর'—মৃত্যু সব কিছুর চরম সমাপ্তি। ফলত মানুষ ঈশ্বরবিহীন এই পৃথিবীতে নির্বাসিত। হেমের কণ্ঠে আমরা তার আর্তনাদ শুনতে পাই যেন।

বাবা একটু চুপ থেকে— 'তারা হয় তো সাংসারিক সফলতা লাভ করছে।'

'হ্যাঁ, কেউ করেছে, কেউ চেষ্টায় আছে।'

—'যাদের সঙ্গে থাকতে, কলেজে পড়তে, তারা আজ ট্রামে করে সেক্রেটারিয়েটে যায় আর তুমি ঘোরো ফুটপাথে?'

—'অনেকটা তাই।'

—'অবিশ্যি এতে ব্যথা পাবারই তো কথা—'

—'না, সেক্রেটারিয়েট আর এমন-কী জিনিশ, সেখানে ঢুকতে না পেরে খুব বঞ্চিত হলাম এ-কথা অবিশ্যি মনে করি না।'

—'নিজের মনকে হয় ত সান্ত্বনা দাও এই ভেবে যে এর চেয়ে কংগ্রেস ঢের বড় জিনিশ। সেখানে সকলের অবাধ প্রবেশ; হয় ত কোনো এক ভবিষ্যতে সেখানে সে নেতা হয়ে বসবে।'

—'না অতদূর ভাবি না।'

—'খানিকটা ভাবো নিশ্চয়ই; ভাবাই স্বাভাবিক। জীবনের আরাম ও বিলাসের জিনিশগুলো যাদের হাত থেকে ফসকে গেছে, অবশেষে তারা ত্যাগ ও মহিমার অকৃত্রিম ভক্ত হয়ে ওঠে, না-হলে দাঁড়াবে কোথায়, বলো? ঐশ্বর্য যাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রবঞ্চিত করে, ঐকান্তিক অশ্রু দিয়ে ত্যাগকে পূজা করবার শক্তি তার যেমন হয়, আর কারু তেমন হয় না।'

—'কই, কংগ্রেসে আমি যাই নি তো!'

—'যাবার দরকার করে না তো; অনেক দিন থেকেই তোমার হৃদয়ে দেশপ্রেমের আসন পেতে রেখেছ হয় ত; সে আসন সব সময়ই চোখে পড়ে না বটে, কিন্তু এক-এক সময় পড়ে, যখন কলেজের বন্ধু ডিস্টিঙ্কট ম্যাজিস্ট্রেট কলকাতায় এসে গ্র্যান্ড হোটেলের দিকে মোটর চালিয়ে ছুটছে আর তুমি পথের বেকার; যখন ছেলেবেলার খেলার সাথি তার মেমসাহেবকে নিয়ে বক্সে বসেছে আর তুমি চার আনার সিটে মাথা গুঁজে আছ।'

একটু চুপ থেকে— 'দেশ, কংগ্রেস, দেশবন্ধু, বিরাট আত্মত্যাগ, অপরিমেয় স্বদেশপ্রেম

পৃথিবীতে যন্ত্রণাভোগের কোনও কার্যকারণ নেই। এই যন্ত্রণাভোগই শেষ কথা, পরলোকে শান্তি পাবার আর কোনো পথ খোলা রইল না। মানুষ অভিশপ্ত, যন্ত্রণা তাকে ভোগ করতেই হবে— এই অভিশাপ। 'কলকাতায় গিয়ে পঁচিশ টাকার ইস্কুল মাস্টারি নিও না' থেকে '…দশ টাকা না হোক, বিশ টাকা পেলে?' হেমের পিতা যন্ত্রণার কথা বোঝেন, হেমের বেদনা উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি হেমকে মানুষের জীবনযাত্রার মূল কথাটি বলেন। বস্তুত তিনি একটি আদর্শ জীবনের কথাই বলছেন, যেটা

— এই সবের কথা তখন মানুষের চিত্তকে সজীব করে গেলে তাকে সান্ত্বনা দেয়।'
গোঁফে হাত বুলিয়ে বাবা বললেন,— 'পৃথিবীতে টিঁকে থাকবার নিজের আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা ও আত্মার কাছে মর্যাদা পেয়ে টিঁকে থাকবার এই রকম সব বিধি ব্যবস্থা আছে। এ-সব না-থাকলে জীবনের নিঃসম্বলতা বড় ভয়াবহভাবে দুর্বিষহ হয়ে উঠত। শুধু কথা ভাবা, শুধু স্বপ্ন নিয়ে খেলা করা। কিন্তু তবুও এ-সবের ঢের মূল্য আছে।'
একটু চুপ থেকে বাবা—'বয়স বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে অধিকাংশ মানুষ নিজেকে সান্ত্বনা দেয় আর-এক ভাবে— জীবনের সঞ্চারিত পথ ও ভগবান কিংবা ভবিতব্যতা ও মৃত্যুর হাতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেয়। কিন্তু সে বয়স এখনো তোমার আসে নি। এখনো দেশের মাটি, কংগ্রেস, কবিতা ও সাহিত্যের মর্যাদা, সাহিত্য স্বপ্ন, অবাস্তববাদ এই সব মোহকে আশ্রয় করেই ফুটপাথে ঘুরে-ঘুরে বেড়াবার জোর পাচ্ছে।'
—'না, মৃত্যুর চিন্তাও মাঝে-মাঝে করি।'
— 'করো?'
—'মাঝে-মাঝে মনে হয় বয়স চৌত্রিশ হয়েছে বটে— সত্তর হয় নি, কিন্তু তবুও সবই যেন সমাপ্ত হয়ে গেছে; কেমন একটা গভীর অবসাদ পেয়ে বসে। সন্ধ্যার অন্ধকারে মেসের বিছানার থেকে উঠতে ইচ্ছা করে না, মনে হয়, সব দেখেছি, জেনেছি, বুঝেছি, সব লিখেছি, তখন ঘুমিয়ে পড়া যাক, অন্ধকার বেড়ে চলুক, কোনোদিনও যেন এই অন্ধকার শেষ হয় না, ঘুম কোনদিনও ফুরোয় না যেন আর।'
—'আর কী-রকম চিন্তা করো?'
চুপ করেছিলাম।
—'এই সৃষ্টিটাকে একটা পাখির খাঁচার মত তৈরি করে নিতে পারা যায়, তখন মানুষের অবস্থা বড় ভয়াবহ হয়ে ওঠে। আমার অনেক সময় মনে হয় জীবনটা কলে ধরা ইঁদুরের মত। যেন চারদিকে শিক আর শিকল শুধু— না আছে রূপ না আছে ফূর্তি—'
বাবা বিশেষ গ্রাহ্য না করে বললেন— 'দুপুরবেলা কী করো? মেসে থাকো?'
—'আগে থাকতাম না, আগে বড় নির্বিঘ্নে ছিলাম।'

নষ্ট হয়ে গেছে, চিরতরে হারিয়ে গেছে। এই অর্থে তার অস্তিত্ব 'অবাস্তব' অপ্রয়োজনীয়। 'কলকাতায় গিয়ে চা খাও না' থেকে 'আর খানিকটা বাতাসা, চা-র সঙ্গে' হেম যেন তার পিতার কাছে শিশু, অসহায় শিশুটিকে তিনি যেন বাইরের পৃথিবী থেকে আগলে রাখতে চান। 'সন্ধ্যার দিকে কী করো?' থেকে '…সেই অপ্রেমের কাজ ও চিন্তার জন্য সহানুভূতি ও সাহায্যের চেষ্টা' হেমের শিল্পী-সত্তার বাস্তব চিত্রটি পাচ্ছি। লেখকের ভাবনার একটি প্রধানতম দিকও এখানে থাকে। 'মস্ত বড় একটা মাঠের

—'কী রকম ?'

—'মেসের বিছানায় একা-একা শুয়ে থাকতে বড় খারাপ লাগত।'

—'একা-একা ?'

—'হ্যাঁ। সবাই অফিসে চলে যায়; অফিসারদের মেস, সকলেই কোথাও-না-কোথাও কাজ করে—জীবনের জবাবদিহি দেয়, জীবনের কাছ থেকে পুরস্কার পায়। এই সব অনেক দিন ভেবে-ভেবে বিছানায় আর শুয়ে থাকতে পারি না আমি আর। মনে হত বেড়িয়ে গেলে আমিও হয় ত সৃষ্টির কাছে নিজের জীবনের কৈফিয়ৎ দেবার সুযোগ বের করে নিতে পারব।'

—'কিন্তু আজকাল বেরোও না বুঝি আর ?'

—'নাঃ,' একটু হেসে বললাম, 'অবাক হয়ে ভাবি, জীবনের চার-পাঁচটা বছর ধরে সমস্তটা দুপুর কলকাতা শহরের কত জায়গায় টো-টো করে বেড়িয়েছি। ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং, ইনকাম ট্যাক্স বিল্ডিং, ক্যালকাটা কর্পোরেশন, ইন্সিওরেন্স অফিসগুলো। এক-একটা জায়গায় পনের-বিশ বার করেও গিয়েছি। নিজের জবাবদিহি দেবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের এমনই প্রবল, এমনই রুচি তার যে সে মনে করে ইনকাম ট্যাক্স অফিসের একজন কেরানি হলেও জবাবদিহি দেওয়া হয়, কিন্তু দুটো কবিতার বই বের করলে হয় না। এই চার বছর যদি আমি এক মনে শিল্পসৃষ্টি করতাম, তা হলে অনেকগুলো মূল্যবান রচনা বের করতে পারতাম।'

—'যাক, চার বছর ঘুরেছ ভালই করেছ; না-যদি ঘুরতে তা হলে হয় ত মনে করতে কতকগুলো অসার কবিতা লিখে রাজত্ব তো নষ্ট করলাম, রাজকন্যাও গেল।

গোঁফে হাত বুলিয়ে বাবা বললেন— 'আমাদের মন এই রকমই কেমন যেন রহস্যের জিনিশ।'

একটু চুপ থেকে— 'আজকাল দুপুরবেলা মেসে কী করো ?'

—'খবরের কাগজ পড়ি।'

—'খবরের কাগজ আর-কতক্ষণ পড়া যায় ?'

মধ্যে কুঁড়ে ঘর···ফিরে চলে যেতে দেখি'—হেমের এই আকাঙ্ক্ষা মানুষের প্রাচীন ও অন্তর্নিহিত বাসনা। সভ্যতা এই সহজাত ধর্মকে বিনষ্ট করেছে। 'কলকাতায় তোমার কোনও বন্ধু-বান্ধব নেই' থেকে···'ফুটপাথে ঘুরে-ঘুরে বেড়াবার জোর পাচ্ছে' হেমের পিতা মানুষের জীবনপ্রণালীর প্রচলিত সব রীতিকে প্রশ্ন করছে। আবার দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ইত্যাদি মানুষের তথা-কথিত মহৎগুণকে তিনি আদতে বেঁচে থাকার কতগুলি বাহ্যিক অবলম্বন মনে করছেন। এখানে লেখকের কণ্ঠস্বরটি স্পষ্ট।

—'বোর্ডাররা প্রায় চার-পাঁচখানা খবরের কাগজ রাখে।'
—'পড়বার ভার দিয়ে যায় তোমার উপর?'
—'পড়তে মন্দ লাগে না কিন্তু শেষ পর্যন্ত—'
—'এই তো রচনার কথা বলছিলে, কিন্তু লেখোটেখো না কেন?'
—'লিখতে চেষ্টা করি মাঝে-মাঝে।'
—'তারপর?'
—'পেরে উঠি না—'
—'কেন? দুপুরবেলা মেস তো বেশ নিরিবিলি।'
—'কবিতা লেখার ওপর আগেকার সে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি আমি।'
—'কেন?'
—'মানুষের জীবন নানা রকম অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আস্তে-আস্তে স্থূল হয়ে পড়ে যেন— অবসাদ আসে, সমাপ্তির গন্ধ পাওয়া যায় যেন···।' একটু চুপ থেকে— 'নবপর্যায়ের কবিতা লিখবার আগে এই স্থূলতা ও অবসাদটাকে ধীরে-ধীরে আত্মসাৎ করে এর [অংশ] হওয়া দরকার। তাই এই কাগজ পড়ে, যা হয়েছে, যা হয় নি সেই কথা ভেবে-ভেবে, জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে সময়টা কাটিয়ে দিচ্ছি।'
দু জনেই খানিকক্ষণ চুপচাপ।
—'তা হলে নবপর্যায়ের কবিতা লিখবে তো?'
—'হ্যাঁ লিখব বই কি?'
—'হ্যাঁ, লিখো, একটা কিছুতে বিশ্বাস রেখো', বাবা বললেন, 'লাইব্রেরি থেকে বই এনে দুপুর বেলাটা পড়ো।'
—'আচ্ছা।'
—'খবরের কাগজ বিশেষ পড়তে যেও না, এই রকম হতাশ পরিশ্রমের কাজ মানুষের জীবনে আর দ্বিতীয়টি নেই।'
বললেন—'লাইব্রেরি থেকে কী বই এনে পড়বে, সে সম্বন্ধে উপদেশ দেবার অধিকার আজ

তিনি মানুষের অস্তিত্বকে মানুষের ব্যক্তিসত্তার পরিপ্রেক্ষিতেই দেখাতে চাচ্ছেন। 'না, মৃত্যুর চিন্তাও মাঝে-মাঝে করি' থেকে '···রাজত্ব তো নষ্ট করলাম, রাজকন্যাও গেল' হেম শূন্যতাবোধে ডুবে গেছে। জীবনধারণের ক্লান্তিতে সে এখন অনন্ত ঘুমের আয়োজন করে অর্থাৎ সে চেতনাকে লুপ্ত করতে চাইছে, যেহেতু চেতনা কেবল যন্ত্রণাই দেয়, কেবল শূন্যতাই সৃষ্টি করে। মাত্র চৌত্রিশ বছরের জীবন যেন এক অতিদীর্ঘ জীবন। কোনও কিছুর আশায় বসে থাকা নেই, কোনও কিছু আবিষ্কৃত হওয়ার

আমার নেই ; যে-বই রুচিতে ধরে, তাই পড়ো। কিন্তু লাইব্রেরিটা যেন উঁচু জাতের হয়, যেমনটি ধরো ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি।' একটু চুপ থেকে— 'এতদিন ধরে তুমি যা শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েছ, তোমার যা শক্তি ও বিচার আছে, তাতে এ-সব লাইব্রেরির থেকে বই পড়বার অধিকার পেলে নিজের চিন্তা বা কল্পনার অপব্যবহার করবে না তুমি—এই আমি আশা করি',— বলে উদ্ভাসিত মুখে আমার দিকে তাকালেন।

আবার খানিকক্ষণ চুপ থেকে তার পর বলতে লাগলেন— 'আমাদের সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে মেসে একা ঘরে তুমি দুপুরবেলাটা কাটাবে— যাদের কোনো কাজকর্ম নেই, জীবনে কোনো নিকট সফলতা নেই হয় ত, যারা অনেক দিন ধরে সংসারের কাছে বিড়ম্বিত হয়ে আসছে, যাদের হৃদয় শেষ পর্যন্ত বাস্তবিক স্থূল নয় কিন্তু সত্যিই খুব কুণ্ঠিত, নিজেকে আত্মপ্রবঞ্চিত করবার শক্তি যাদের ঢের কম, আত্মপীড়িত করবার শক্তি খুব বেশি— এই দুপুরবেলার সময়টা তাদের কাছে কত যে যন্ত্রণার জিনিশ হতে পারে আমি তা খুব গভীরভাবেই বুঝি।'

কিছুক্ষণ থেমে থেকে শেষে বললেন, 'কিন্তু তবুও কয়েকটা কাজ করতে তোমাকে নিষেধ করছি আমি, তুমি করতে যেও না। চাকরি-বাকরি না পেয়ে অলস হয়ে থাকতে হচ্ছে বলে মিছিমিছি নিজেকে নির্যাতিত করতে যেও না, তোমার চেয়ে অনেক কম শক্তি নিয়ে অজস্র লোক সংসারের কাছ থেকে ঢের বেশি পুরস্কার পাচ্ছে বলে। কলকাতায় অহরহই এই জিনিশ দেখবে তুমি, দুঃখ পেতে যেও না, কারু প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, ট্রাম-বাস-লরি মোটর ব্যস্ত-সমস্ত নিরবচ্ছিন্ন ভিড়ের সমাবেশ নিয়ে কলকাতা শহরের কাজের চাকা দিনরাত ঘুরে চলেছে বলে নিজের মনের স্থৈর্য নষ্ট করে বসো না, উত্তেজিত হয়ে সময়ে-অসময়ে ফুটপাথে ঘুরে মরো না ; কাজকর্মহীন লোকের পক্ষে কলকাতায় থাকা একটা বিড়ম্বনা। ফ্যাকরা হচ্ছে এই যে চারদিকের ঘাত-প্রতিঘাতের সম্পর্কে তারা মুহূর্তে-মুহূর্তে আত্মবিস্মৃত হয়ে ঠিকরে বেরোয় ; নিজের প্রকৃত পথ ভুলে যায়, আগুনের মুখে দেওয়ালি পোকার মত জীবনের যথার্থ সম্ভাবনাগুলোকে বারংবার অন্ধভাবে নষ্ট করে ফেলে। নিজের শক্তি ও রুচির পরিমাপ খুব গভীরভাবে বিচার করে

নেই, এমনি একটি সমাপ্তির ভাব। 'আজকাল দুপুরবেলা মেসে কী করো ?' থেকে '···তাকিয়ে-তাকিয়ে সময়টা কাটিয়ে দিচ্ছি' শিল্প ও জীবনের দ্বন্দ্ব। একই সঙ্গে শিল্প সৃষ্টির প্রক্রিয়াটিও এখানে বলা হচ্ছে। এক অনন্ত পর্যবেক্ষণ। 'তাহলে নব পর্যায়ের কবিতা লিখবে তো ?' থেকে '·· সূর্যের আলোয় বিশ্বাস করে অগ্রসর হয়ো' হেমের পিতা নয় যেন পরমপিতা। হেমকে আত্মগত হতে বলছেন। জীবনের গভীর সত্যের কথা বলছেন। 'খবরের কাগজ···আর দ্বিতীয়টি নেই'—সংবাদপত্র

ঠিক করে নিও। নিজেকে যে-পথের উপযুক্ত মনে করো কুণ্ঠানিষ্ঠ হয়ে সেই পথেই চলো। জীবনে আশা, আশাভঙ্গ, পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পরিণামের হিশেবে অবাঞ্ছিত থেকে সূর্যের আলোয় বিশ্বাস করে অগ্রসর হয়ো।'

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর বাবাকে আমি বললাম—'দেখেছ বাবা, কী রকম বৃষ্টি পড়ছে।'

—'হ্যাঁ।'

—'দেশের এই বর্ষাকে জীবনের সত্তর বছর বসেই তো দেখলে।'

—'দেখলাম।'

—'পাড়াগাঁয়ের এই বৃষ্টি আমার খুব ভাল লাগে। বিশেষত এমনি রাতের বেলা।'

—'বেশ জিনিশ।'

মনে-মনে ভাবলাম, এই রাত আর বর্ষা যদি চিরকাল থাকত। এই বাঁশের জঙ্গলের বাতাস, ঘরের পাশের লেবু পাতার থেকে ছুপ-ছুপ জলের শব্দ, মাঠে-মাঠে ব্যাঙের কোলাহল, জাম, তেতুল ও কাঁঠালের ঠাণ্ডা ডালপালার অবিরাম শব্দ, কোনো তিমিরচারিণীদের সঙ্গে মাঝে-মাঝে প্রেতজীবনের প্রতিধ্বনির মত দু-তিনটি দাঁড়কাকের অবশ বিহ্বল কলরব।

—'তুমি শুয়ে পড়েছ বাবা?'

—'না।'

—'কী করছ?'

—'না, একটু আলো জ্বালিয়ে পড়ছি।'

—'রাতের বেলা পড়ো না, তোমার তো ক্যাটারেক্ট।'

বাবা একটু হেসে, 'তেমন সিরিয়াস ক্যাটারেক্ট তো নয়। ভগবান শিগগির অন্ধ করবেন বলে মনে হয় না।' একটু চুপ থেকে—'এই রাতে আলোতে চোখে তেমন খোঁচা লাগে না তো।' আরো খানিকক্ষণ চুপ থেকে, 'অবশ্য নীল চশমাটা পরেছি, চোখে বেশ আরাম লাগে।'

...

সম্পর্কে এ সকল কথা আজ ফলে গেছে, স্কুলের ছাত্রের সময়ের স্কেল নয়, বন্ধ্যা সময়ের শাসক সংবাদপত্র। এখানে আদতে কোনো স্কেলই নেই। সীমা অতিক্রমকারী সময়। এক সময়হীন সময়। 'সফলতা', 'ব্যর্থতা' প্রসঙ্গটি এখানে থাকে। হেমের পিতার কথায় এই দ্বন্দ্বটি সম্পূর্ণ অর্থ পায়। বস্তুত, তিনি চিরাচরিত সফলতার ধারণাটিকেই অস্বীকার করছেন। এইভাবে হেমের পিতা উপন্যাসের চিন্তার সামগ্রিক কাঠামোয় একটি প্রধান স্তম্ভ হয়ে যায়।□